আনিসুল হক

বিক্ষোভের দিনগুলিতে প্রেম

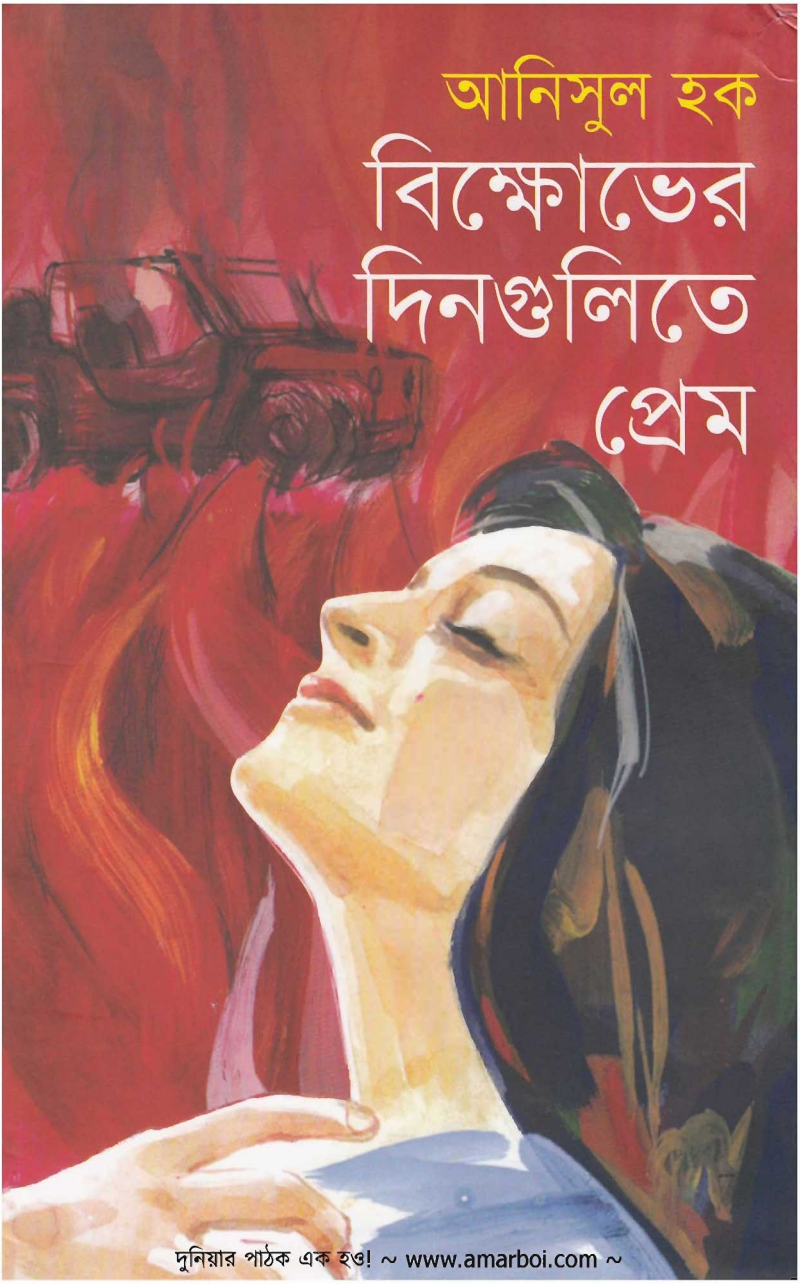

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেসব ছাত্র জিয়াউর রহমানের সময়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে বিচারপতি সাত্তারের আমলে বুয়েটে ভর্তি হয়ে হু মু এরশাদের আমলে ক্লাস শুরু করে, তাদের অনেকেই এরশাদের পতন হওয়া পর্যন্ত বুয়েট এলাকাতেই বসবাস করেছে। এই প্রেমকাহিনি সেই সময়কার। একদিকে স্বৈরাচারী প্রেমিকপুরুষ, কবি ও সৈনিক লে. জে. হু মু এরশাদের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চলছে, এরশাদ একের পর এক প্রেম করে চলেছেন, কবিতা লিখছেন, রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তন করছেন, অন্যদিকে যুবাবয়সী শিক্ষার্থীরা তাদের হৃদয় ও জীবন-জীবিকা-লেখাপড়াসংক্রান্ত দৈনন্দিন জটিলতার পাশাপাশি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। এই উপন্যাস প্রেমের, এই উপন্যাস সংগ্রামের।

Prothoma
2015010000103
TK. 400.00

শওকত রাজনীতি বোঝে না। সে গ্রামের ছেলে। অত্যন্ত মেধাবী। বুয়েটের পরীক্ষায় সে বেশ ভালো করে। পাস করে বুয়েটেরই শিক্ষক হবে। সেই শওকতেরও শরীরে ও মনে একটা ব্যথা আছে—অসাম্প্রদায়িক শিক্ষানীতির দাবিতে ১৯৮৩ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারিতে ছাত্ররা যখন আন্দোলন করছিল, তখন এরশাদ সরকারের পুলিশ তার পা ভেঙে দিয়েছে। মাকসুদার রাহমান কবি হতে চায়। তার কবিতার প্রেরণা আর্কিটেকচারের মেয়ে মৌটুসি। প্রেমের কবিতা লিখতে লিখতে সে-ও যুক্ত হয় এরশাদবিরোধী আন্দোলনে। ন্যাভাল আর্কিটেকচারের আবীর পত্রমিতালির সূত্র ধরে প্রেম করে শানুর সঙ্গে; হলের রুমেই একদিন আবীর আবিষ্কার করে শানুর পেটে সিজারিয়ানের দাগ।

শহীদ হন রাউফুন বসুনিয়া। বুকে-পিঠে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লিখে বুকের রক্তে রাজপথে গণতন্ত্রের দাবি লেখেন নূর হোসেন।

কবিতা ও কৃষ্ণচূড়া ভালোবাসতেন যে ডাক্তার মিলন, আড়াই বছরের মেয়ে শামাকে রেখে যান আন্দোলনে, আর ফিরে আসেন না।

আলাদা আলাদা মানুষ, কিন্তু সবাই মিলেছে রাজপথে, ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে, স্বৈরাচারবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের দিনগুলোয়।

পুলকায় পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

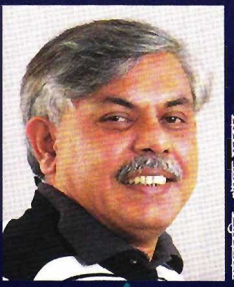

আলোকচিত্র : খালেদ সরকার

আনিসুল হক

জন্ম ৪ মার্চ ১৯৬৫, নীলফামারী। শৈশব ও বাল্যকাল কেটেছে রংপুরে। পড়েছেন পরীক্ষণ বিদ্যালয় রংপুর, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর কারমাইকেল কলেজ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায়। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনি, শিশুসাহিত্য—সাহিত্যের নানা শাখায় তিনি সক্রিয়। টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন। ২০১২ ও ২০১৩ সালের অমর একুশে বইমেলায় প্রথমা থেকে প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সে সময়ের রাজনীতিবিদদের নিয়ে লেখা উপন্যাসের দুটি পর্ব *যারা ভোর এনেছিল* ও *উষার দুয়ারে*। ২০১৪ সালে বেরিয়েছে *আমারও একটা প্রেমকাহিনি আছে*। পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ বেশ কয়েকটি পুরস্কার।

প্রচ্ছদ : মাসুক হেলাল

বিক্ষোভের দিনগুলিতে প্রেম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিক্ষোভের দিনগুলিতে প্রেম

আনিসুল হক

প্রথমা প্রকাশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমা প্রকাশন

বিক্ষোভের দিনগুলিতে প্রেম
গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৫ আনিসুল হক
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০১৫
মাঘ ১৪২১, ফেব্রুয়ারি ২০১৫
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মাসুক হেলাল
মুদ্রণ : ডট প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
৩/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৪০০ টাকা

Bikkhobher Dingulite Prem
A novel in Bangla by Anisul Hoque
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 88-02-8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 400 only

ISBN 978 984 91201 4 8
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উ ৎ স র্গ

আশির দশকের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সকল শহীদকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিক্ষোভের দিনগুলিতে প্রেম একটা উপন্যাস; এর প্রতিটি ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপ কাল্পনিক। যদিও ঐতিহাসিক ঘটনার সন-তারিখের ক্রম ঠিক রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

...

সবার অলক্ষ্যে নূর হোসেনের প্রশস্ত ললাটে
আঁকা হয়ে যায়,
যেন সে নির্ভীক যোদ্ধা, যাচ্ছে রণাঙ্গনে।
উদোম শরীরে নেমে আসে রাজপথে, বুকে-পিঠে
রৌদ্রের অক্ষরে লেখা অনন্য স্লোগান,
বীরের মুদ্রায় হাঁটে মিছিলের পুরোভাগে এবং হঠাৎ
শহরে টহলদার ঝাঁক ঝাঁক বন্দুকের সিসা
নূর হোসেনের বুক নয়, যেন বাংলাদেশের হৃদয়
ফুটো করে দেয়; বাংলাদেশ
বনপোড়া হরিণীর মতো আর্তনাদ করে, তার
বুক থেকে অবিরল রক্ত ঝরতে থাকে, ঝরতে থাকে।

—বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, শামসুর রাহমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিয়াউর রহমানের আমলে আইএসসি পরীক্ষা দিতে বসেছিল উত্তরবঙ্গের দুই আলাদা গ্রামের ছেলে শওকত ও মাকসুদার। বরিশালের আরেকটা হলে পরীক্ষা দিচ্ছিল আবীর। পরীক্ষার হলে বসেই তারা শুনতে পায়, প্রেসিডেন্ট নিহত হয়েছেন। দেশবাসী শোনে উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তারের রোগকম্প্র রেডিও ভাষণ, 'আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রেসিডেন্ট "হত্যা" হয়েছেন।' দেশবাসী আরও শোনে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সৈনিকদের প্রতি সেনাবাহিনী-প্রধান এইচ এম এরশাদের আকুল আবেদন, 'সংবিধানের পবিত্রতার নামে আপনারা বশ্যতা স্বীকার করে নিন।' শওকত ও মাকসুদারদের আইএসসি পরীক্ষা শেষ হয় বিচারপতি সাত্তারের আমলে। তাদের পরীক্ষার ফল যখন বেরোবে, তখন এইচ এম এরশাদ ক্রমাগত সাক্ষাৎকার দিয়ে চলেছেন এবং বলছেন, রাষ্ট্রশাসনে সৈনিকদের হিস্যা চাই। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ওরফে বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা দেবে বলে যখন তারা নগরবাড়ি ঘাট থেকে ফেরি করে যমুনা পেরিয়ে আরিচা হয়ে ঢাকায় আসে, আর আবীর আসে বরিশাল থেকে ঢাকাগামী জাহাজে, তখন দেশে সামরিক শাসন, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের নাম হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, সংবিধানের পবিত্রতা যাঁর নারীবন্ধুদের সুগন্ধির আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। সিএমএলএ কথাটার মানে ছিল 'চিফ অব মার্শাল ল অ্যাডমিনস্ট্রেটর', লোকে বলত—'চেঞ্জ মাই লাস্ট অ্যানাউন্সমেন্ট।' কারণ সামরিক শাসন জারির সেই পাতাঝরা চৈতালি দিনে তিনি সকালে যে হুকুম জারি করতেন, বিকালে তা যেত বদলে। সেনাপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সাক্ষাৎকার আগে *বিচিত্রায়* ছাপা হয়েছিল প্রচ্ছদকাহিনি হিসেবে, তারপর সিএমএলএর কবিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাসমারোহে প্রকাশিত হতে থাকে *বিচিত্রার* 'শামসুর রাহমান নির্বাচিত কবিতা' বিভাগে ও *দৈনিক বাংলার* প্রথম পৃষ্ঠায়।

বুয়েটের ক্লাস শুরু হতে হতে হু মু এরশাদ সিএমএলএ থেকে নিজেই প্রেসিডেন্ট। তত দিনে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের ছবি ও খবরসংবলিত বিলাতি কাগজের ফটোকপি হাতে হাতে বিলি হচ্ছে।

তারপর ক্লাস বন্ধ হয়ে গেল, হল খালি করে দেওয়া হলো, শওকত ও মাকসুদার আবার যমুনা পার হয়ে ফিরে গেল বাড়ি, কারণ, বুয়েটের ছেলেরা বুয়েটের বেদখল হওয়া জমি উদ্ধারের জন্য মারামারি করতে গেল পলাশীবাসীর সঙ্গে। ইতিহাসে এটা পলাশী প্রান্তরের দ্বিতীয় যুদ্ধ হিসেবে পরিগণিত হওয়ার কথা থাকলেও ইতিহাসের কোথাও তার কোনো উল্লেখ নাই।

এরপর আবারও ক্লোজড সিনে ডাই। অনির্দিষ্টকালের জন্যে বুয়েট বন্ধ ঘোষণা এবং হল ত্যাগের নির্দেশ। এবারের উপলক্ষ ভিসিআরে ছবি দেখার স্বাধীনতা। বুয়েটের হলগুলোয় চিরকালই বার্ষিক প্রীতিভোজের সুখ্যাতি রয়েছে। এক হলের সঙ্গে আরেক হলের প্রতিযোগিতা হয় প্রীতিভোজে পরিবেশিত খাদ্যের আইটেমের সংখ্যা ও পরিমাণ নিয়ে, গোটা মুরগি থেকে শুরু করে ২৪ প্রকারের খাদ্য থাকে সেই তালিকায়। তেমনি এক প্রীতিভোজের শেষে ছাত্ররা তাদের টেলিভিশন রুমে ভিসিআরে হিন্দি ছবি দেখছিল, এই সময় শিক্ষকগণ শৃঙ্খলা বিধানের জন্য সেই হলে উপস্থিত হন এবং ভিসিআর বাজেয়াপ্ত করে বগলদাবা করে প্রস্থানে উদ্যত হন। তখন হলের দোতলা তেতলার ছাদ থেকে ছেলেরা ফুল নিক্ষেপ করতে থাকে শিক্ষকদের উদ্দেশে, অবশ্য ফুলের সঙ্গে ইয়া বড় বড় ফুলের টবও ছিল। সেই ঘটনায় কোনো শিক্ষক আহত হননি, মাথায় পড়লে নিহতই হতেন, অতএব তদন্ত কমিটি গঠন, ছাত্রনেতাদের বহিষ্কার এবং তা প্রত্যাহারের দাবিতে কঠোর ছাত্র আন্দোলন। আবারও বুয়েট বন্ধ ঘোষিত। (সেই বহিষ্কারাদেশ কঠোর আন্দোলনের মুখেও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়নি, বহিষ্কৃতরা পাসকোর্সে স্নাতক পাস করে বিসিএসে অবতীর্ণ হয়ে ফরেন সার্ভিসসহ ভালো ভালো সরকারি পদে আসীন হয়েছেন পরবর্তীকালে, সেই বহিষ্কারকারী শিক্ষকেরা বিদেশে গেলে তাদের বহিষ্কৃত ছাত্রদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সফলতায় মুগ্ধ হন এবং তাদের বাসভবনে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বিশেষভাবে আপ্যায়িত হন)।

এরপরে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থেকেছে, সেই ছুটির নাম ছিল 'এরশাদ ভ্যাকেশন'।

কাজেই যে ছাত্ররা জিয়ার সময়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে সাত্তারের আমলে ভর্তি হয়ে হু মু এরশাদের আমলে ক্লাস শুরু করে, তাদের অনেকেই এরশাদের পতন হওয়া পর্যন্ত বুয়েট এলাকাতেই বসবাস করেছে। অন্তত মাস্টার্সের ছাত্র হিসাবে অনেকেই হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পতনের মুহূর্তটি ছাত্রাবস্থাতেই অবলোকন ও উদ্‌যাপন করতে সক্ষম হয়।

এই প্রেমকাহিনি সেই সময়কার। সেই সময়কার, যখন একদিকে স্বৈরাচারী প্রেমিকপুরুষ, কবি ও সৈনিক লে. জে. হু. মু. এরশাদের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চলছে, এরশাদ একের পর এক প্রেম করে চলেছেন, কবিতা লিখছেন, রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তন করছেন, অন্যদিকে যুবাবয়সী শিক্ষার্থীরা তাদের হৃদয় ও জীবন-জীবিকা-লেখাপড়া-সংক্রান্ত দৈনন্দিন জটিলতার পাশাপাশি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম করে চলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামি মুখখানা করুণ করে বলেন, 'বাবা, তোমাকে ডেকে পাঠালাম। কারণ, তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে, বাবা!'

শওকত মনে মনে হিসাব কষছে। মামি তাকে কেন এ রকম তেল দিচ্ছেন। তেলের দাম তো কমেনি। সয়াবিন হোক সরষে হোক, কেরোসিন হোক আর পেট্রল হোক, যেকোনো তেলই মূল্যবান। ঘটনা কী?

মামি বলে চলেন, 'তুমি না সুজির হালুয়া পছন্দ করো! তোমার জন্য সুজির হালুয়া করেছি। আলতা, দাও, আমার বাবাকে হালুয়া দাও।'

শওকত মামির মুখের দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে।

আলতা আসেন। পঞ্চাশোর্ধ্ব মহিলা। ভাঙা গাল। শীর্ণ হাত-পা। পাকা চুল। দাঁতে পানের দাগ। তার গায়ে বোটকা গন্ধ। বোধ হয় পানের সঙ্গে তামাকও খান। তার হাতে একটা ট্রে। ট্রেতে এক গেলাস পানি। একটা পিরিচে সুজির হালুয়া।

শওকত সুজির হালুয়া পছন্দ করে, এমন কোনো প্রমাণিত তথ্য নাই। তবে সে থাকে হলে, ছাত্রাবাসে, পেটে খিদে লেগেই থাকে, খাদ্যে তাই তার অরুচি নাই। সে পিরিচ হাতে তুলে নিয়ে হালুয়ায় চামচ বসায়।

মুখে পুরে যা বোঝে :

এই হালুয়ায় সুজি আছে।

এক ফোঁটা তেল বা ঘি এতে দেওয়া হয়নি।

পানি দেওয়া হয়েছে।

চিনিও কিছু পরিমাণে দেওয়া হয়ে থাকবে।

এটা খাদ্য নয়। অখাদ্য। গরুকে দিলেও এটা গরু খাবে না, ছাগল খেতে পারে। কারণ ছাগলে কী না-খায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত নিজেকে ছাগল বলে মনে করে না।

মামি বলেন, 'নাও বাবা, পুরোটা খাও। তোমার জন্য আলতা এটা খুব যত্ন করে রেঁধেছে। ও আবার তোমাকে খুব পছন্দ করে।'

শওকত তার মাথার অ্যানটেনা চারদিকে বোঁ বোঁ করে ঘোরাচ্ছে। মামি ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন, শওকত ধরতে পারছে না।

মামির মতলব বোঝা শওকতের পক্ষে একটু শক্তই। সুতির শাড়ি কুচি করে পরা, চোখে চশমা, চুলের সামনের অংশ সাদা, বাকি অংশ সম্ভবত কলপ দেওয়া, পাতলা মুখ, খাড়া নাক, কপালে ভাঁজ, গালে সামান্য মেছতার দাগ, মাঝারি উচ্চতা ও একহারা গড়নের ভদ্রমহিলাকে কোনো গার্লস হোস্টেলের সুপারিন্টেনডেন্টের চরিত্রে সবচেয়ে ভালো মানাত। তবে তিনি তা নন। ফ্যামিলি প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন মামি। আজিমপুর কলোনিতে তাঁর বাসা। শওকতদের ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের খুব কাছে। কুড়ি মিনিটের হাঁটাপথ। রিকশাও নেওয়া যায়। তবে এই সামান্য পথের জন্য রিকশা নেওয়া মানে বিলাসিতা। শওকত বড়লোকের ছেলে নয়। দুটো টিউশনি করে সে বুয়েটে পড়ার খরচ সামলায়।

মামি তাঁর কথাটা পাড়েন। 'বাবা, আলতার মায়ের খুব অসুখ।' তারপর গলার স্বর নামিয়ে তিনি বলেন, 'মনে হয় আলতার মা মারাই গেছে। ওকে তো বাড়ি পাঠাতে হবে। কেমন করে পাঠাই, বলো।'

শওকত ভুরু কোঁচকায়। এই বৃদ্ধা মহিলার মায়ের এত দিন বেঁচে থাকারই বা কী দরকার ছিল। আর এখন সে যদি বাড়ি যেতে চায়, শওকতের তাতে কী করণীয়?

মামি শওকতের হাত ধরে বলেন, 'তুমি আলতার সঙ্গে যাও। ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসো।'

শওকতের মাথার সার্কিটগুলো একযোগে জ্বলে ওঠে। এই প্রস্তাব এখনি 'না' করে দিতে হবে। সে বিন্দুমাত্র না ভেবে মিথ্যা কথা বলে, 'আমার তো মামি পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট পরীক্ষা। সেশনালের ঝামেলায় আমি একেবারে চিড়েচ্যাপ্টা। আমার তো একচুল নড়ারও উপায় নাই।'

অখাদ্য সুজির অর্ধেকটা টুকরা মাত্র খেয়েছে শওকত। মামি সঙ্গে সঙ্গে পিরিচটা হাতে তুলে নেন। শওকত যাবে না, এটা বুঝেছেন তিনি। তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাকিটা সুজি খাওয়ানোর কোনো মানে হয় না।

মামি বলেন, 'যাতায়াত খরচ হিসেবে তিন শ টাকা দিতে রাজি ছিলাম। দেড় শ টাকা বাসভাড়া লাগবে। অন্তত এক শ টাকা বেঁচে যাবে।'

এবার শওকতের হিসাব করার পালা। দুটো টিউশনি থেকে সে পায় ছয় শ টাকা। মাসে ১২ + ১২ মোট ২৪ দিন যেতে হয় স্টুডেন্টের বাড়ি। পাঁচ শ টাকায় চলে যায় মাসের খরচ। এক শ টাকা বাঁচে। হাতে জমানো কিছু টাকা আছে। এখন এক শ টাকা ইনকাম করার জন্য কাজের বুয়াকে নিয়ে ময়মনসিংহ যাওয়ার মানেই হয় না। দুটো দিন অপচয়। ট্রেনে বা রিকশায় তার পাশে বসে আছে আলতা বানু, এটা সে ভাবতেই পারছে না।

সে বলে, 'মামি, আমি অবশ্যই যেতাম। কিন্তু আমার যে পরীক্ষা।'

মামি সঙ্গে সঙ্গে সুজির পিরিচটা আলতার হাতে তুলে দিয়ে বলেন, 'আচ্ছা, পরীক্ষা থাকলে কী আর করা। যাও তাহলে। তোমার ডাইনিং না আবার বন্ধ হয়ে যায়। তুমি তো আবার হোস্টেলে গিয়ে খাবে। তুমি তো আবার সব সময় বলো, ডাইনিংয়ের খাওয়াটা না খেলে অপচয় হয়ে যায়। কী দরকার অপচয় করার।'

এরপর আর বসে থাকার মানে হয় না। শওকত উঠে পড়ে।

রাত আটটা। আজিমপুর কলোনি থেকে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে শওকত এগোয় তাদের হলের দিকে। বেশ শীত পড়েছে। লাইটপোস্টের আলো ঘিরে কুয়াশার সাদা। পথে লোকজনও বেশ কম। শেরেবাংলা হলের কাছাকাছি আসতেই সে মিছিলের স্লোগানের আওয়াজ শুনতে পায়। বুয়েটের ছেলেরাই মিছিল করছে।

খানিক পর শওকত পলাশী এলাকার কাছে চলে এলে শুনতে পায় স্লোগানের কথাগুলোও :

মজিদ খানের শিক্ষানীতি
মানি না মানব না

ঘেরাও ঘেরাও ঘেরাও হবে
সচিবালয় ঘেরাও হবে

কথাগুলো শওকতের মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। মজিদ খান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রলোক কে, তিনি কী শিক্ষানীতি দিয়েছেন, সেটা শওকত জানে না। জানে না, কারণ সে জানতে চায় না। রাজনীতি নিয়ে তার কোনোই আগ্রহ নাই।

সে গ্রামের ছেলে। তার বাবা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। এবং তাদের তিন বিঘা কৃষিজমি আছে।

সে যখন বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসে, তখন বাবা তাকে জিগ্যেস করেন, 'তুমি কোথায় পড়বে?'

সে তখন বলে, 'বুয়েটে।'

বাবা বলেন, 'কুয়েতে?'

সে বলে, 'না বাবা। বুয়েটে। ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি।'

'তাই বলো। আমি ভাবলাম, তোমাকে আবার কে কুয়েতে পাঠাচ্ছে।'

শওকতের বাবার তিন মেয়ে। এক ছেলে। শওকতই ছোট। ছেলেটাকে তিনি মনের মতো করে মানুষ করতে চেয়েছেন। ক্লাস টু-থ্রিতে পড়ার সময় শিক্ষিত কেউ তাদের বাড়িতে এলেই বাবা ডাকতেন, 'শওকত, এদিকে আসো। বলো তো তিন দিন হইতে বৃষ্টি পড়িতেছে, তার ইংরাজি কী?'

'ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর থ্রি ডেজ।'

'কোন টেন্স?'

'প্রেজেন্ট পারফেক্ট কনটিনিউয়াস টেন্স, বাবা। বাবা, আমি যাই। মা ডাকতেছে।'

'ইংরাজিতে বলো।'

'ফাদার, মে আই গো নাউ। মাদার ইজ কলিং মি।'

'ভেরি গুড। গো।'

বাবা তাকে মানুষ করতে চেয়েছেন। বাবার ইচ্ছা ছিল, শওকত বড় হয়ে ডাক্তার হবে। কিন্তু শওকত রক্ত দেখতে পারে না। এমনকি মুরগি জবাইও সে কোনো দিনও করেনি। এই ছেলে ডাক্তার হবে কী করে?

অগত্যা বাবা বলেন, ঠিক আছে, ইঞ্জিনিয়ার হও।

ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির খোঁজ কিন্তু মামাই দিয়েছিলেন। তিনি এজিবি অফিসে চাকরি করেন। স্ত্রীর সূত্রে পাওয়া বাসায় আজিমপুর কলোনিতে থাকেন। পলাশীর ওপর দিয়ে নিজের অফিসে যান। বুয়েটের ক্যাম্পাস তার আসা-যাওয়ার পথের ধারে পড়ে। তাই তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির খবর শওকতের বাবাকে দেন। তিনি চিঠি লেখেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইজান,

শুনিলাম শওকত হোসেন ফার্স্ট ডিভিশনে আইএসসি পাস করিয়াছে। খুবই ভালো খবর। সে কী পড়িবে? আমার পরামর্শ হইল, সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুক। ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির খুবই সুনাম। এখানকার ইঞ্জিনিয়াররা জীবনে মানুষ হয়। আমি ধানমন্ডি দিয়া যখন যাই, বড় বড় রাস্তার ধারে এক বিঘা দুই বিঘা জমির উপরে একতলা-দোতলা বাড়ি দেখি। এ সমস্ত বাড়ির মালিকই ইঞ্জিনিয়ার। এই লাইনে বহুত টাকা। আপনি অবশ্যই তাহাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াইবেন। তাহাকে ঢাকা পাঠাইয়া দেন।

কাজেই শওকত আজ যে বুয়েটে পড়ছে, তার পেছনে শামসু মামার অবদান আছে। তার বাসায় এসেই সে প্রথম উঠেছিল। মামি অবশ্য তাকে দিয়ে তার দুই ছেলেকে পড়িয়ে নিয়েছিলেন সেই সময়েই। কাজেই বলা যায়, শওকত মামার বাড়িতে লজিং থেকেছে। কিন্তু মামা তাকে আসলেই খুব আদর করেন। এবং তাকে মনে করেন একটা জ্বলন্ত প্রতিভা।

শওকত এগোচ্ছে নজরুল ইসলাম হলের দিকে। ডাইনিং বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই তাকে খেয়ে নিতে হবে। এখানে রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছ। মেহগনি, শিরীষগাছ। সেসবে কাক বসে থাকে। বুয়েট থেকে এমন কোনো ছাত্র বের হয়নি যে এই পথে হেঁটেছে, কিন্তু কাকের বর্জ্য তার মাথায় পড়েনি।

শওকতের পাশ দিয়েই মিছিল যাচ্ছে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিল।

জ্বালো জ্বালো
আগুন জ্বালো।

স্বৈরাচারের গদিতে
আগুন জ্বালো একসাথে

ঘেরাও ঘেরাও ঘেরাও হবে
সচিবালয় ঘেরাও হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার বাম দিকে আহসানউল্লাহ হল। বুয়েটের ছেলেরা এটাকে ডাকে 'হসপিটাল' বলে। সেটা পার হলে ছোট ছোট নারকেলগাছের ফাঁক দিয়ে বামে দূরে দেখা যায় শহীদ স্মৃতি হলের লাল ইটের নতুন ভবন। ডান দিকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোয়ার্টার, সাদা চারতলা ভবন, মসজিদ এবং আরেকটু এগোলে ডানে শিক্ষকদের সিরামিক ইটের বানানো কোয়ার্টার।

শওকত মিছিলের বিপরীত দিকে হেঁটে আহসানউল্লাহ হল ও নজরুল ইসলাম হলের ক্যানটিনের পাশ দিয়ে ইউকসু ভবন পাশে রেখে নজরুল ইসলাম হলের ডাইনিং হলে ঢুকে পড়ে। ডাইনিং হল বেশ ফাঁকা ফাঁকা। এখন বাজে সোয়া নটা। একটু পরই ডাইনিং বন্ধ হয়ে যাবে। বেশির ভাগ ছাত্রই খেয়ে নিয়েছে। এখন তারাই খাচ্ছে, যারা টিউশনি করে ফিরেছে। এদের পরনে প্যান্ট। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এরা বাইরে থেকে এসেছে। যারা হল থেকে যায়, তারা সাধারণত লুঙ্গি পরে থাকে। লুঙ্গি পরেই ক্যানটিনে বা ডাইনিংয়ে খেতে আসে। লুঙ্গি পরেই পপুলার হোটেলে খেতে যায়। সেখানে ফটোকপিয়ার মেশিনে 'চোথা' ফটোকপি করে। 'চোথা' শব্দটা সে প্রথম বুয়েটে এসেই শিখেছে। এর মানে হলো নোট।

আজকে একটা মাত্রই তরকারি আছে। টাটকিনি মাছ। এই একটা খাবার শওকত একদম পছন্দ করে না।

'আজকে আর কী ছিল তরকারি?' ডাইনিংয়ের কর্মচারী আবদুস সালামকে জিগ্যেস করে শওকত।

'গরুর মাংস ছিল, স্যার।' আবদুস সালাম জবাব দেয়।

শওকতের আফসোস হয়। যদিও ডাইনিংয়ে গরুর মাংস কখনো দেয় না, দেয় মোষের মাংস। এগুলো খেতে রবারের মতো। তবু তো মাংস। এখন এই ঠান্ডা ভাত, ঠান্ডা পাতলা মাছের ঝোল আর সত্যিকারের পাতলা ডাল তাকে গিলতে হবে। এই অমৃত খেতে তার কান্না আসবে। তবু যখন সে মামির বাসায় যায়, প্রধানত মামার টানেই, তখন মামি যদি তাকে জিগ্যেস করেন, 'বাবা, ভাত খেয়ে যাবা তো?' সে জবাব দেয়, 'না, মামি। ডাইনিংয়ের ভাত তো নষ্ট হবে তাহলে।'

যেকোনো হলের ডাইনিংয়ের ডাল অত্যন্ত বিখ্যাত। নজরুল ইসলাম হলের ডালের কোনো তুলনা নাই। এটাতে হলুদ দেওয়া হয়, লবণও সম্ভবত দেওয়া হয়, কিন্তু ডাল জিনিসটা দেওয়া হয় কি না, সন্দেহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়েন্সের ছাত্ররা জানে, অ্যাভোগাড্রোর সূত্র অনুযায়ী অনেক পরিমাণ পানিতে এক ফোঁটা ডাল দিলে তার অণু-পরমাণু আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না। হলের ডালেও ডাল খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল। সেই ডাল তরকারির কাপে ঢেলে নিয়ে তর্জনী দিয়ে ঘুঁটে নেয় শওকত। কোনো লাভ নাই। তবু ঘুঁটানিটা সে দেবেই।

ভাত খেয়ে কসকো সাবানের গলিত খণ্ড দিয়ে বেসিনে হাত ধুয়ে হলদে ভেজা তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে নিজের চেহারাটা একবার দেখে নেয় শওকত। তিন দিনের না কাটা দাড়ি আগাছার মতো দেখাচ্ছে। ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা, পায়ে বাটার ৯৯ টাকা ৯৫ পয়সার স্যান্ডেল, টেট্রনের ঢোলা প্যান্ট, গায়ে সাদা-কালো স্ট্রাইপের শার্ট, মাথার চুল সামনের দিকে পাতলা হয়ে আসছে বলে চিত্রনায়ক রাজ্জাকের মতো দেখায় তাকে। গাত্রবর্ণ শ্যামলা, কিন্তু শীতের কারণে বোধ হয় একটু বেশি শ্যামলা দেখাচ্ছে।

ডাইনিং হল থেকে বেরোয় শওকত। টেলিভিশন রুম কাম হলরুমে উঁকি দেয়। রুম প্রায় ফাঁকা। টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন হচ্ছে। গ্যাকোটাচ। অ্যান্টি-সেপটিক ট্রিপল অ্যাকশন সোপ।

নাহ্। রুমে যাওয়া দরকার। তাঁর রুম দোতলায়। ২১১ নম্বর রুম। তারা রুমমেট তিনজন। বাকি দুজনের একজন শাহিন ভাই। বগুড়ার ছেলে। বড়ই দিলদরিয়া। সারাক্ষণ হা হা করে হাসে। আরেকজন হাবিব। আর্কিটেকচারে পড়ে। জাসদ করে। মানিকগঞ্জে বাড়ি। খুব ভালো ফুটবল খেলে।

রুমে গিয়ে শওকত চমকে ওঠে।

মামা বসে আছেন। তার টেবিলের পাশের চেয়ারে। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। মামার মুখের এক পাশে আলো। আরেক পাশে ছায়া। মামার গায়ে কালো কোট। সাদা শার্ট। মামার মুখটা শুকনো দেখাচ্ছে। তাঁর চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। মামার দাড়ি-গোঁফ কামানোই থাকে, ফরসা ধবধবে পাতলা মুখমণ্ডল, মাঝারি গড়ন। সকালে শেভ করে বেরিয়েছেন বলে গালে নাতিদীর্ঘ সাদা দাড়ি উঁকি দিচ্ছে।

একটু আগেই সে মামার বাসায় গিয়েছিল। মামার দেখা তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়নি। মামা কোথায় গিয়েছেন, মামিকে সে জিগ্যেস করেছিল। মামি বলেছিলেন, 'অফিস থেকে আসে নাই। আজকে তার একটু মিরপুর যাবারও কথা আছে। জমিটার চারদিকে বেড়া দেবে মনে হয়। শাকসবজি আবাদ করবে।'

মামা কেন তার রুমে বসে আছেন?

মামা বলেন, 'এই, তুমি কোথায় ছিলা? কতক্ষণ হলো তোমার জন্য বসে আছি। শোনো, আমার অফিসে একটা ফোন এসেছিল। বলল, তোমার বাবার অসুখ। তোমার বাবা তোমাকে দেখতে চান। তুমি কি বাড়ি যেতে পারবা?'

শওকতের সমস্ত শরীর কাঁপছে। সে বলে, 'বাবা কোথায়?'

মামা বলেন, 'তোর বাবা বাড়িতে।'

'কী অসুখ আপনি কি কিছু শুনেছেন?'

মামা বললেন, 'তা শুনি নাই। বদরগঞ্জ থানা এক্সচেঞ্জ থেকে ফোন আসছে। বলল, তোমার বাবা তোমাকে বাড়ি যেতে বলেছেন।'

'বাবা নিজে বলেছে?'

'আরে তোমার বাবার সাথে তো কথা হয় নাই। তোমার বাবার অসুখের কথা শুনে চলে আসলাম। আমি সোজা। অফিসে কাজ ছিল। তাই আসতে দেরি হয়েছে। এসে দেখি তুমি নাই। তাই বসে থাকলাম।'

'আপনি একটা চিঠি লিখে গেলেই তো পারতেন। আমি আপনাদের বাসাতেই গিয়েছিলাম। মামি ময়মনসিংহ যেতে বললেন। কিন্তু কেমন করে যাই, বলেন। আমার তো পরীক্ষা। আপনি কষ্ট করলেন। এতক্ষণ বসে থাকলেন।'

'না। ভাবলাম দেখা করেই বলি কথাটা।'

তিনি শওকতের হাতে পাঁচ শ টাকার একটা নোট দিয়ে বলেন, 'যাও, বাড়ি যাও। টাকাপয়সা হাতে থাকা ভালো।'

শওকতের ভয় আস্তে আস্তে কেটে যায়।

মামা চলে গেলে শাহিন ভাইয়ের প্রবেশ। মোটাসোটা মানুষ। বলেন, 'কী শওকত। তোমার মামা দেখি তোমারে ট্যাকা দিল। ব্যাপার কী?'

'বুঝলাম না। বললেন, বাড়ি যাও। তোমার বাবার অসুখ।'

'তুমি কী বললা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি কিছু বলি নাই। একটা প্রবলেমে পড়েছি। মামিকে বলেছি, আমার পরীক্ষা।'

'ক্যা? সেটা বলতে গেলা কিসক?'

'আরে আমারে কাজের বুয়ারে নিয়া ময়মনসিংহ যেতে বলে...'

'তাহলে তো তুমি মুশকিলেই পড়লা। তবে বেশি কিছু মুশকিল না। বাবার অসুখ আর কাজের মেয়ের বাড়ি যাওয়া সমান না। বাবার অসুখ হলে লোকে পরীক্ষার মাঝেও বাড়ি যেতে পারে।'

'জি।'

শওকতের তার বাবার মুখটা মনে পড়ে।

বাবা। শুকনো মুখ। গালে দাড়ি। পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চির বেশি লম্বা হবেন না। শওকতও হয়েছে তার চেয়ে দুই ইঞ্চি বেশি। শওকতের মুখটাও শুকনোই। গালটা বসা থাকে। সে-ও নিয়মিত শেভ করে না। অযত্নে গজানো কিছু দাড়ি দুই-চার দিন গালে ঝুলে থাকে। শওকতের বাবা পাঞ্জাবি পরেন। ঘিয়ে রঙের। সাথে লুঙ্গি। কোনো বিশেষ উপলক্ষ থাকলে পায়জামা। পায়ে বাটার খুব ভালো রাবারের তৈরি নাগরা। তিন মেয়ের পর শওকতকে পেয়ে তিনি যেন যক্ষের ধন পেয়েছেন। নিজের মতন করে মাস্টার সাহেব ছেলেকে মানুষ করার চেষ্টা করেছেন। ছেলেও বাবার স্বপ্ন পূরণ করার চেষ্টা করছে।

শওকতের মায়ের কথাও মনে পড়ে। মা গ্রামের সরলা মহিলা। কৃষিপরিবারের গৃহিণী। বাড়িঘর সামলানো, ধান সেদ্ধ, শুকানো, গরু-ছাগল, হাঁসমুরগি, গাছগাছালির যত্ন—সবই তাকে করতে হয়।

শওকতের কান্না পাচ্ছে।

শওকত তার বেডে বসে পড়ে। স্যান্ডেল খুলে পা দুটো ওপরে তুলে পিঠটা দেয়ালে ঠেকিয়ে নেয়।

হঠাৎ শাহিন ভাই বলেন, 'মিয়া, তোমার বাবার কোনো পছন্দের মাইয়া আছিল নাকি?'

'জি, শাহিন ভাই?'

'আরে, তোমার বাবা কি তোমার জন্য কোনো পাত্রী পছন্দ কর‍্যা থুছে?'

শওকতের ছায়াচ্ছন্ন বিমর্ষ মনে যেন এক টুকরো রোদ এসে পড়ে। তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি হতে পারে? বাবারা অনেক সময় এই রকম করেন। অসুখের কথা বলে ছেলেকে ডেকে পাঠান। ছেলে বাড়ি ফিরে এলে বাবা তাকে শয্যাপাশে ডেকে নিয়ে হাত ধরেন। তারপর বলেন, 'বাবা, তুই না করিস না। অমুকের বাবাকে আমি কথা দিয়েছি।'

শওকত ভাবে, ব্যাপারটা একটু যাচাই করা দরকার। কিন্তু রংপুরের বদরগঞ্জের গ্রামে শওকত খবর নেবে কী করে? ফোন নাই। বাসে করে যেতে ১৬-১৭ ঘণ্টা লেগে যায়। রাস্তায় দুটো ফেরি। বদরগঞ্জ কি এখানে-সেখানে।

সকালবেলা বিআরটিসির বাস রংপুর পর্যন্ত যায় বটে। কিন্তু টিকিট তো আগে থেকে করে রাখতে হয়। নাইট কোচও আছে। কালকে রাতের আগে তো আর সে কোনো বাস পাচ্ছে না।

'যা হোক, তা হোক। কালকে রাতে রওনা দেই। কী বলেন শাহিন ভাই?'

'আমিও তা-ই মনে করি। যাও। হায়াত মউত রেজেক দৌলত আল্লাহর হাতে। বিয়াটাও। যাও।'

শওকত মনে মনে স্থির করে, পরের দিন নাইট কোচেই সে বেরিয়ে পড়বে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাবিব রুমে আসে রাত দুইটার পরে। ততক্ষণে এই রুমের বাকি দুই বাসিন্দা শওকত আর শাহিন ঘুমিয়ে পড়েছে। সে কেডস পরে ছিল এতক্ষণ। জুতা খুলতেই মোজার গন্ধে নিজেই বিচলিত বোধ করে। ১০টা পর্যন্ত সে ছিল মিছিলে। তারপর আহসানউল্লাহ হলের ক্যানটিনে বসে ডিম-বিরিয়ানি খেয়েছে। দাম দুই টাকা। তারপর চা। চায়ের সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বুয়েট শাখার মিটিং। আগামীকাল সচিবালয় অভিমুখে মিছিল বেরোবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাতে বুয়েটের ছেলেরাও যাতে দলে দলে যোগ দেয়, সেজন্য নানা রকমের কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এমনিতেই দেশে সামরিক শাসন। মিছিল-মিটিং সব নিষিদ্ধ। রাত থেকেই খবর আসছে, রাজপথে সেনাবাহিনী নামানো হবে।

উত্তেজনায় হাবিবের ঘুম আসতে চায় না। আজকে তারা বুয়েট ক্যাম্পাসের ভেতরে মিছিল করেছে। ক্যাম্পাসের ভেতরে বলেই হয়তো পুলিশ বাধা দেয়নি। কিন্তু কালকে কী হবে, কেউ জানে না।

ছাত্রদের সঙ্গে সরকার কি গন্ডগোল পাকাতে চাইবে? ছাত্রদের খেপিয়ে কেউ ক্ষমতায় থাকতে পেরেছে?

শাহিন ভাইয়ের ঘুম ভেঙে যায় হাবিবের নড়াচড়ায়। তিনি উঠে বসেন। বলেন, 'কী মিয়া, তোমার মোজা দুইটা বাইরে থুয়া আসো না ক্যান? নাকে তো লাথি দিচ্ছে। তারপর কও তো দেখি কাইলকা কী হবে?'

'স্যরি স্যরি, আমি মোজা বাইরে রাখছি। সারা দিন সেইম জুতা সেইম মোজা পরা। আমি হাত-পা ধুয়ে আসছি। এসে তারপর বলছি।'

হাবিব বাথরুমে গিয়ে হাত-পা ভালো করে ধোয়। তারপর রুমে ফিরে এসে দেখতে পায়, শাহিন ভাই আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোঁ গোঁ করে তার নাক ডাকছে।

হাবিব নিজের মশারিতে হাত দেয়। মশারি টাঙিয়ে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুতে যাবে, এমন সময় শাহিন ভাইয়ের গলা—'কী মিয়া, কাইলকা কী হবে না কয়াই যে তুমি ঘুমাতে গেলা?'

'আরে আপনি তো নাক ডাকছেন।'

'আরে, আমার নাক ডাকতে পারে, বুঝলা, আমি জাগ্যা আছি। কও দেখি কী অবস্থা?'

'কালকে আমরা মিছিল নিয়ে যাব। বুয়েট থেকেই দুই হাজার ছেলেমেয়ে যাবে। ধরেন জাসদ বাসদ ইউনিয়ন মুজিববাদী ছাত্রলীগ—পুরা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ—দুই হাজার জন তো হবেই। ঢাকা ইউনিভার্সিটি মেডিকাল ইডেন—কালকে একেবারে বিপ্লব হয়ে যাবে।'

'পুলিশ করতে দিবে মনে করতেছ। আর্মি নাকি নামাচ্ছে?'

'বাধা আসবে যেখানে, লড়াই হবে সেখানে।'

'তোমরা কী লড়াই করবা? তোমাদের কাছে কী আছে? ট্যাংক আছে, কামান আছে? বন্দুক আছে? গুলির মুখে কী করবা?'

'ছাত্রদের গুলি করবে? বাংলাদেশে ছাত্রদের উপর গুলি চালায়া কেউ কোনো দিন ক্ষমতায় থাকতে পেরেছে?'

'ছাত্ররা কি আর সেই ছাত্র আছে? বিচারপতি সাত্তারকে সরায়া দিয়া এরশাদ ক্ষমতা নিল। একটা বছর যায় প্রায়। কেউ তো কোনো টুঁ শব্দ করল না।'

'তখন করে নাই। এখন করবে। ক্ষমতার কামড়াকামড়ির মধ্যে তো ছাত্ররা নাই। এখন আমাদের কলিজায় হাত দিয়েছে। নিজের মতো করে শিক্ষানীতি বানাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক শিক্ষানীতি। আমরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক অসাম্প্রদায়িক শিক্ষানীতি চাই। আমরা আমাদের ইস্যু নিয়ে মাঠে নামব, এইটাই তো স্বাভাবিক।'

'মা, মা, তোমার গরু তো ম্যালা হয়া গেছে, ধান খায়া শেষ করি দিল'—ঘুমের মধ্যে শওকত কথা বলে ওঠে।

হাবিব আর শাহিন ভাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকান। না। রাত অনেক হয়েছে। এখন ঘুমোনো দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা দুজনেই মশারির মধ্যে ঢুকে পড়ে। শাহিন ভাই লেপের নিচে শরীর গলান। হাবিব কাঁথামুড়ি দেয়। তার লেপ নাই, কাঁথা দিয়েই সে এই শীত পার করল।

হাত বাড়িয়ে বেডের সঙ্গে লাগা টেবিল ল্যাম্পের সুইচ বন্ধ করে হাবিব।

কিন্তু ঘুম আসতে চায় না। শাহিন ভাই প্রশ্নটা কিন্তু খারাপ করেননি। একটা বছর হয়ে গেল, এই রকম একটা অন্যায় সামরিক শাসন দেশের ওপর চেপে বসল, তার প্রতিবাদ হলো কই? প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হলেন চট্টগ্রামে, তখন তো এরশাদ সাহেব সংবিধানের প্রতি আনুগত্য দেখালেন, কোটি কোটি টাকা খরচ করে একটা নির্বাচন হলো, বিচারপতি সাত্তার সেই নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে জিতেও গেলেন আওয়ামী লীগের ড. কামাল হোসেনকে হারিয়ে, তার পর থেকেই জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা নেবার জন্য উসখুস করছিলেন। এক রৌদ্রালোকিত দিনে তিনি টেলিভিশন কেন্দ্রে হাজির, দেশের এই দুর্দশায় দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী চুপ করে বসে থাকতে পারে না। ব্যস, সংবিধান স্থগিত, মৌলিক অধিকার বলতে আর কিছু রইল না। আর সকালে একটা সামরিক ফরমান জারি করেন তো, রাতে সেটা প্রত্যাহার করেন, তাঁর সামরিক ফরমানগুলোকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বেড়ে যেতে লাগল জিনিসপাতির দাম। ক্ষমতা নেবার সময় তিনি বলেছেন, সব মার্শাল ম্যান যেমন বলে থাকে, তাঁর কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই, দেশ তো চালাবেন রাজনীতিকেরা, যথাসময়ে নির্বাচন দিয়ে তিনি ব্যারাকে ফিরে যাবেন, সে কথা এর আগেও কেউ কোনো দিন রাখেনি, এরশাদেরও রাখার কোনো লক্ষণ নাই। এখন তিনি হাত দিয়েছেন ছাত্রদের হৃৎপিণ্ডে। তিনি একটা শিক্ষানীতি প্রবর্তন করার চেষ্টা করছেন, যা ঘোরতর সাম্প্রদায়িক। এটা কেন তারা মেনে নেবে?

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাই আন্দোলন-সংগ্রাম সংগঠিত করছে। এরই মধ্যে মিছিলের ওপর পুলিশের ট্রাক তুলে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে ছাত্রনেতা সেলিম ও দেলোয়ারকে। ছাত্রদের রক্তে এরই মধ্যে এরশাদের হাত রঞ্জিত হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আসল সংগ্রামের শুরু আগামীকাল।

একটা সময় ঘুমিয়ে পড়ে হাবিব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলের গেট থেকে আলিমুদ্দি ভাই এসে তার শরীর ধরে ঝাঁকাচ্ছেন, 'আবীর স্যার, আবীর স্যার, আপনার গেস্ট আইছে।'

ঘুম ভাঙা চোখে তাকায় আবীর।

আজকে ক্লাস হবে না।

শহীদ স্মৃতি হলের আবীরের তাই একটাই পরিকল্পনা, সে আজকে বেশি বেলা করে ঘুমাবে।

আবীরের গায়ের রং ধবধবে ফরসা, তার টানা টানা চোখ, নাকটা খাড়া, মেয়েদের মতো পাতলা ঠোঁট, কোঁকড়ানো চুল। তার উচ্চতা শুধু খুব বেশি নয়। বরিশালের ছেলে আবীর। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে ন্যাভাল আর্কিটেকচারে। পড়াশোনায় মন নাই। রাজনীতিতে আগ্রহ নাই। আজকে সচিবালয় ঘেরাও হবে, নাকি হবে না, তার কিছুই যায়-আসে না।

সে গভীর রাত পর্যন্ত হলের গেটের লাল দেয়ালে ঝোলানো কয়েন বক্স ফোনে কথা বলেছে শানুর সঙ্গে। পকেট ভর্তি করে কয়েন নিয়ে দারোয়ানের চেয়ার টেনে নিয়ে তাতে বসে ফোনালাপ করে সে। কাল রাতেও করেছে।

এখন দারোয়ান তার ঘুম ভাঙিয়ে বলছে, তার গেস্ট এসেছে।

আবীরের রুমমেট রুমীকে দেখা যাচ্ছে না।

আবীর বলে, 'আলিমুদ্দি ভাই, গেস্ট আবার কে আসল? নাম বলেছে?'

আলিমুদ্দি বলেন, 'না, নাম কয় নাই। লেডিস গেস্ট।'

লেডিস গেস্ট শুনেই ঘুম ছুটে পালিয়ে যায় আবীরের সর্বাঙ্গ থেকে।

কে আসতে পারে?

তার মেজ খালা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাকি শানুই?

শানু এর আগে কোনো দিন হলে আসেনি।

আবীর সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*র ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন কলামে লিখেছিল, এই বর্ষায় সোনার কদম কাকে দেব? নিচে তার শহীদ স্মৃতি হলের ঠিকানা। প্রতি শব্দ ২ টাকা। ২২ টাকা লেগেছিল মোট। এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার ৭ দিনের মধ্যেই ৭টা চিঠি এসে গেল। ৭টা চিঠিই সম্ভবত মেয়েদের লেখা। অন্তত চিঠিগুলোতে তা-ই দাবি করা হয়েছিল।

এর মধ্যে শানুর চিঠিটা পছন্দ হলো আবীরের।

শানু লিখেছিল, 'সোনার কদম নয়, একগুচ্ছ প্রাকৃতিক কদম, হলুদ সোনালি রেণু, আর নিচে কটা সবুজ পাতা—আমারও তো ইচ্ছা করে বৃষ্টিদিনে ভেজা হাতে তুলে নিই। তার সোঁদা গন্ধ বুক ভরে গ্রহণ করি।

তারপর বৃষ্টিজলে চোখ ধুয়ে ঘরে ফিরি।'

রোমান্টিক কথাবার্তা। ছোট্ট, গোছানো চিঠি।

আবীর তিনজনকে জবাব দিয়েছিল অবশ্য।

শেষে শানুর সঙ্গেই তার জমে গেল।

প্রতি সপ্তাহে একটা চিঠি আসে। আহা, সেই চিঠিটার জন্য কী ব্যাকুল প্রতীক্ষাই না করতে হয় আবীরকে।

AMARBOI.COM

পত্রমিতালি অনেকেই করে। থার্ড ব্লকের শামীম পত্রমিতালির জন্য বিখ্যাত। তার ১৯ জন বান্ধবী। প্রতিদিন তিন-চারটা চিঠি আসেই। যাদের কাছ থেকে চিঠি পায়, তাদের সবার নামই মেয়েলি। পত্রমিতারা নিজেদের মেয়ে বলে দাবি করলেও সবাই যে মেয়ে, তা না-ও হতে পারে।

শামীম সবার কাছে নিজের ছবি হিসেবে চিত্রনায়ক রাজ্জাকের প্রথম জীবনের পাসপোর্ট সাইজ সাদাকালো ছবি পাঠায়। নীলক্ষেতের ফুটপাতে রাজ্জাকের ছবি কিনতে পাওয়া যায়। প্রথম দেখায় চেনা যায় না যে ছবিটা রাজ্জাকের।

মেয়েদের কাছে চিঠি পাঠায়, চিঠিতে রাজ্জাকের ছবি পাঠায়, আর তাতে সে লেখে, সবাই বলে আমি নাকি রাজ্জাকের মতো দেখতে।

শামীম একজন মেয়ের সঙ্গে পত্রমিতালি করতে গিয়ে খানিকটা ধরাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেয়েছে। খুব সুন্দর একটা মেয়ে। রাজশাহীতে থাকে, রাজশাহী মেডিকেলে পড়ে। তাকে সে নিয়মিত উপহার পাঠায়। পার্সেল করে।

একদিন বিকাল তিনটা। ক্লাস সেরে এসে দুপুরের ভাত খেয়ে পুরো বুয়েট ঘুমিয়ে পড়েছে। যাকে বলে অলস দুপুর। সেই সময় ডাক বিলি করা হয় রুমে রুমে।

শামীম ঘুমভাঙা চোখে তার কাছে আসা চিঠিগুলো নিয়ে আধা শোয়া হয়ে খাম ছিঁড়ছিল।

তার রাজশাহীর বান্ধবীর চিঠি খুলতেই কতগুলো ছোট ছোট কালো চুল এসে তার মুখের ওপর ঝিরঝির করে পড়ল। তখন তার রুমমেট সাজু জেগে ছিল। সে ঘটনা দেখে পুরো হলে রাষ্ট্র করে বেড়ায়। শামীমের বান্ধবী তারে চুল পাঠিয়েছে, কোঁকড়া, মোটা, ছোট ছোট চুল।

পরে শামীম ওই পত্রমিতার খোঁজে রাজশাহী মেডিকেলে পড়া তার বন্ধুদের দিয়ে তদন্ত করিয়েছিল। ফলাফল খুবই হতাশাব্যঞ্জক। ওই নামে রাজশাহী মেডিকেলে কোনো মেয়ে নাই। আর যে পাড়া থেকে চিঠিটা আসত, সেই পাড়ায় কোনো মেয়ে মেডিকেল কলেজেই পড়ে না। তার মানে, কোনো-না-কোনো ছেলে তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। শামীম অবশ্য তাতে হতাশ নয়। কারণ, ওই মেয়ের পেছনে তার তিন শ সাতাশি টাকা খরচ হলেও বিভিন্ন মেয়ের কাছ থেকে সে প্রতি মাসে এক শ দুই শ টাকার উপহার নিয়মিতভাবেই পাচ্ছে।

আবীরের ঘটনাটার মধ্যে অকৃত্রিমতার ভাগই বেশি।

আবীর শানুর প্রেমে পড়ে গেছে।

শানুর চিঠির জন্য সে ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করে।

সকালবেলা দৈনিক *ইত্তেফাক*-এ প্রকাশিত মহাজাতকের রাশিচক্র পড়ে সে দেখে, আজ কি রোমান্স শুভ নাকি অশুভ। বৃশ্চিক রাশির জাতক আবীর যদি দেখে রাশিচক্রে রোমান্স শুভ লেখা আছে, তার মনে হয়, আজ শানুর চিঠি আসবে।

খুব সুন্দর চিঠি লেখে শানু। কবিতার মতো তার ভাষা।

তারপর একদিন ফটো চেয়ে বসে আবীর।

বুয়েটের মনোগ্রাম-সংবলিত রাইটিং প্যাড কিনতে পাওয়া যায় সাত্তার মিয়ার দোকানে, যেটা কিনা নজরুল ইসলাম হল ক্যানটিনের লাগোয়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে শ্মশ্রুমণ্ডিত সাত্তার মিয়া তার বড় ভুঁড়িটা গেঞ্জিতে ঢেকে কোকাকোলা আর বার্গার বিক্রি করে। সেই প্যাডের পৃষ্ঠায় হালকা হলুদ কালিতে উভয় দিকে রুল টানা, মানে অনেকগুলো বর্গক্ষেত্র আঁকা। ইকোনো কলমের দাম তিন টাকা, সেটা দিয়ে লেখা হয় ভালো। যদিও কলমটা উল্টো করে পকেটে রাখলে ফুটোওয়ালা তলা দিয়ে কালি বেরিয়ে যেতে পারে। অনেক ছাত্রেরই বুকপকেটের কোনায়, প্যান্টের পকেটে ইকোনো কলমের কালির দাগ স্থায়ী।

আবীর চিঠি লেখে শানুকে :

'আস্তে আস্তে আমি তোমার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি শানু। আমি সারাক্ষণ কেবল তোমার কথাই ভাবি। কেবল তোমাকে কল্পনা করি। কল্পনা করি তুমি দেখতে কেমন। কিন্তু কখনো তো তোমাকে দেখিনি। তাই একবার একেক রকম ভাবি। আমার কল্পনা আহত হয়। আমার মনে হয়, আহা, একবার যদি আমি তোমাকে দেখতে পেতাম। শানু, তুমি কি আমাকে তোমার একটা ছবি পাঠাবে?'

শানু ছবি পাঠায়। আবীর ছবি দেখে মুগ্ধ। শাড়ি পরা এক নারী। বয়স বোধ হয় ২২ কি ২৪। আবীরের চেয়ে একটু বেশিই হবে। রঙিন ছবি। সিঙ্গাপুরে তোলা। পেছনে সমুদ্র। নীল জল, নীল আকাশ। হলুদ শাড়ি উড়ছে বাতাসে। বুকে নৌকার পাল। বাতাসে ফুলে আছে।

আবীর উল্টে পাল্টে ছবি দেখে।

ডেকে তার বন্ধু আনিসকে দেখায়।

আনিস বলে, 'দোস্ত, এইটা ফটো না, এইটা ভিউকার্ড।'

'কী বলিস?'

'হ। এইটা ফটো হইতেই পারে না।'

'না। ফটো। এই তো উল্টা দিকে ফুজি লেখা।'

'আমার মনে হয়, তোর শানু কোনো ছেলে। কোত্থেকে মেরে-কেটে তোর কাছে একটা মেয়ের ছবি পাঠাইছে।'

'তুই বলছিস? এটা হতে পারে? শানু আসলে একটা ছেলে?'

'অবশ্যই। শানু নামে প্রচুর ছেলেকে আমি চিনি। শানু ব্যানার্জি নামে একজন আছে...'

আবীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ছেলেরা যে মেয়ে সেজে ছেলেদের চিঠি লেখে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই ঘটনা তো আর দূরে কোথাও ঘটেনি। তাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই আছে।

কিন্তু শানু সে রকম হতে পারে না।

আবীর চিঠি লেখে শানুকে, 'শানু, আমার বন্ধু আনিস বলে, তুমি নাকি ছেলে। মেয়ে সেজে আমাকে লেখো।'

শানু বলে, 'আচ্ছা তোমার ফোন নম্বর দাও, আবীরবাবু। আমি তোমাকে ফোন করছি।'

আবীরের তো কোনো ফোন নম্বর নাই। আছে একটা ফোন। হলের গেটে। সেটার নম্বর আছে একটা। বাইরে থেকে ফোন এলে হলের কর্মচারীরা ডেকেও দেয়। সেই নম্বরটিই কি দেবে? দিয়েই দেখা যাক না।

তারপর সে তার ফোন নম্বর জানিয়ে দেয়।

একদিন বিকালবেলা ফোন আসে।

আবীর তখন টিভি রুমে বসে টারজান দেখছিল।

আলিমুদ্দি ভাই এসে বলেন, 'আবীর স্যার, আপনার ফোন।'

আবীরের কলজেটা একটা চড়ুইপাখি হয়ে উড়ে যায় বুকের খাঁচা ছেড়ে। তার ফোন! তার কাছে তো কোনো ফোন আসার কথা নয়! কখনো আসে না। তাহলে কি...

'হ্যালো, আবীর বলছ?'

'হ্যাঁ। কে?'

'আমি শানু।'

'শানু?'

'কী, আমার ভয়েস শুনে কী মনে হয়? আমি ছেলে, নাকি মেয়ে?'

'শানু। তোমার কণ্ঠস্বর খুব সুন্দর, শানু...'

এই শুরু হয় ফোনে কথা বলা। নেশার মতো হয়ে যায় আবীরের। সে রোজ এক গাদা সিকি নিয়ে শহীদ স্মৃতি হলের গেটের কাছে দেয়ালে ঝোলানো কয়েন বক্স টেলিফোনের পাশে দাঁড়ায়। কথা বলতে শুরু করে। কিছুক্ষণ কথা বলে, আর কয়েন ঢোকায়। কথা বলতে বলতে তার পায়ে ব্যথা হয়ে যায়। তখন সে দারোয়ানের চেয়ারটা নিয়ে আসে। সেটায় বসে। আবার কথা বলে। কথা বলতে বলতে রাত ভোর হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দারোয়ান ঘুমিয়ে পড়ে। মশার কামড়ে তার পা ফুলে ওঠে। তবু কথা ফুরায় না।

কী যে তাদের এত কথা!

আজ আলিমুদ্দি বলছেন, তার গেস্ট এসেছে, লেডিস গেস্ট। শুনে খানিকক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকে আবীর। তারপর দ্রুত দৌড়ায় কমন বাথরুমে, দাঁত মাজে। তারপর তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টে নেয়।

তেতলা থেকে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে যায়।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন নারী। তার পরনে আকাশি রঙের শাড়ি। সে দেয়ালের নোটিশ বোর্ডের নোটিশ পড়ছে।

আবীর কাছে গিয়ে কাশি দেয়।

নারীটি ঘুরে তাকালে আবীরের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই হলো শানু।

আবীরের বুক কাঁপে, মনের মধ্যে একটা ভালো লাগার অনুভূতি খেলে যায়, শানু মেয়েটা দেখতে বেশ সুন্দর।

শানু বলে, 'কী, কেমন চমকে দিলাম, তাই না?'

আবীর বলে, 'ভালোই চমকে দিয়েছ। কিন্তু আমাকে তুমি বললেই পারতে যে আজ আসবে। আমি তো এখন ক্লাসেও থাকতে পারতাম।'

শানু হাসে। কাল রাতেই তো ফোনে কথা হলো, 'তুমি বললে, আজকে সবাই মিছিল করবে, আজ ক্লাস হবে না, আর তুমি ঘুমুবে। আমি তাই চলে এসেছি।'

'আসো। গেস্টরুমে বসি।'

হলের ছেলেরা এরই মধ্যে অকারণে গেটের সামনে দিয়ে চলাচল করা শুরু করেছে। নারী অতিথি আসছে শুনলেই পুরো হলে খবর হয়ে যায়। ছেলেরা অকারণে দোতলা তিনতলা চারতলার বারান্দায় চক্কর দিতে থাকে, উঁকি দেয় গেটের দিকে, হুডতোলা রিকশা থেকে কে নামে, কতজন নামে। শাড়ি পরা নাকি সালোয়ার-কামিজ। আজকেও শানুর আগমনে হলের ছেলেদের মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

ঈর্ষান্বিত অনেকগুলো চোখের সামনে দিয়ে শানুকে সঙ্গে নিয়ে আবীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিথি-কক্ষে প্রবেশ করে।

শহীদ স্মৃতি হলের অতিথি কক্ষটা ছোট।

সেখানে লাল রঙের সোফা পাতা।

রুমটা প্রায় সময় বন্ধ থাকে বলে একটা বোটকা গন্ধও পাওয়া যায় ঢোকামাত্রই।

শানু বলে, 'ব্রেকফাস্ট করেছ?'

'না। ঘুম থেকে তো ডেকে তুলল। করিনি।'

'করবে না?'

'না। আজকে নাশতা করার প্ল্যান নাই। আজকে নাশতাকে ট্রিকসে ফেলব।'

'ট্রিকসে ফেলবে মানে?'

'মানে হলো, ১২টা পর্যন্ত ঘুমালে আর নাশতা লাগে না। একেবারে হলের ডাইনিংয়ের দুপুরের খাবার খেয়ে নিলেই হলো।'

'এমন অনিয়ম করলে শরীর খারাপ করবে না?'

'না। অনিয়ম করছি কই? এটাই তো নিয়ম।'

'এই জন্য তুমি এত হালক-পাতলা।' শানু হাসে। তার এক পাশে গজদন্ত। দাঁতের ওপরে দাঁত। তাকে কী যে অপরূপ লাগে।

শানু বলে, 'কাছে এসে বসো। তুমি না হাত দেখতে পারো? আমার হাতটা দেখে দাও তো। দেখো তো আমার ভাগ্যে কী আছে?'

এ যে মেঘ না চাইতেই জল। আবীর মুখোমুখি সোফা ছেড়ে এসে শানুর পাশে বসে।

শানুর ডান হাতটা নিজের হাতে তুলে নেয়। হাত দেখে। কিরোর বই পড়ে পড়ে সে হাত দেখা শিখে নিয়েছে। উদ্দেশ্য অবশ্যই মেয়েদের হাত দেখা। নারীর ভাগ্য দেখে দেখে সে তার নারীভাগ্য খুলতে চায়। বরিশালের কলেজে এই কাজে সে তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। আজ যদি কপাল খোলে।

সে শানুর হাতের উষ্ণতাটুকু আগে অনুভব করে। তারপর কনিষ্ঠার নিচের দাগগুলো দেখে বলে, 'তোমার তো মাত্র একটা হাজব্যান্ড। তবে বাচ্চা-কাচ্চা নাই।'

শানু হাসে, 'তারপর?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি যাকে ভালোবাসবে, তাকেই বিয়ে করবে।'

'ভেরি গুড।'

আবীর শানুর আঙুলের নখের নিচে নিজের বুড়ো আঙুলের চাপ দেয়। বলে, 'দেখছি তোমার আঙুলের ইলাস্টিসিটি কেমন। ফ্লেক্সিবল আঙুল মানে তোমার মনটা নরম। শক্ত হলে তুমি কঠিন মেয়ে। একবার সিদ্ধান্ত নিলে সেটা আর পাল্টাও না।'

'কী বুঝলে।'

'বুঝলাম, তোমার মনটা খুব নরম।'

শানু কী পারফিউম দিয়েছে? এমন মাদকতাপূর্ণ তার গায়ের গন্ধ।

শানুর শাড়ির ওপর একটা পাতলা নীল রঙের চাদর। ঘরের ভেতরে এখন একটু গরম গরমই লাগছে। শানু চাদর সরিয়ে রাখে।

তারপর আবীরের হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে খেলে। তারপর চুমু খায় হাতের পিঠে।

আবীর উঠে গেস্টরুমের দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়।

শানু উঠে দাঁড়িয়েছে। আবীর তাকে আলিঙ্গনে বাঁধে।

শানু বলে, 'নাও, তোমার ব্রেকফাস্ট। খাও।'

শানু তার ঠোঁট বাড়িয়ে দেয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকসুদার রাহমান (আসলে রহমান) তিতুমীর হলের চারতলা থেকে বই হাতে নামছে। শামসুর রাহমানের কবিতার বই। এই সকালবেলা সে শামসুর রাহমানের কবিতা পড়ছে!

অথচ এখন তার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ড্রয়িং করার কথা।

টি-সেট সেট-স্কয়ার সে কিনে এনেছে নিউ মার্কেট থেকে। তারা এখন একটা একতলা বাড়ির প্ল্যান আর এলিভেশন আঁকছে। আগামীকাল এই ড্রয়িং জমা দিতে হবে। তার সহপাঠীরা সবাই এরই মধ্যে ড্রয়িং করে ফেলেছে।

আজকে যে ক্লাস হবে না, এটা মাকসুদার আগে থেকেই অনুমান করে রেখেছে। কাজেই তার ইচ্ছা, আজকের দিনটায় সে হলের রুমে টি-সেট আর সেট-স্কয়ার নিয়ে লেগে পড়বে ড্রয়িং করতে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক। মাকসুদার কী মনে করে শামসুর রাহমানের *দুঃসময়ে মুখোমুখি* বইটা নিয়ে পড়তে শুরু করেছে।

আর এই কবিতাটার লাইনগুলো পড়তেই সে চমকে ওঠে :

> জেনেছি কাকে চাই, কে এলে চোখে ফোটে
> নিমেষে শরতের খুশির জ্যোতিকণা...

সাত মাত্রার মাত্রাবৃত্তে লেখা। কী অসাধারণ ছন্দ! আর দেখো কী চিত্রকল্প! চোখে খুশির জ্যোতিকণা ফুটছে। তুমি কল্পনা করো না এই চোখ দুটো! চোখের তারায় জ্যোতির কণা ফুটছে। আর সেটা শরতের! আহা! আহা!

মাকসুদার রাহমান বইটা নিয়ে নেমে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। তিনটা সিঁড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একসাথে পার হচ্ছে সে। সে যাচ্ছে দোতলায় তার আরেক বন্ধুর কাছে। তার নাম সানাউল্লাহ।

সানাউল্লাহও কবিতা পড়ে। কবিতা লেখে।

আর মাকসুদার রাহমান নিজের নাম বদলে করেছে মাকসুদার রাহমান। শামসুর রাহমান যেমন রাহমানের র-এ আ-কার দেন, তেমনি মাকসুদার রাহমানও আ-কার যোগ করে নিজের নামের একটা আকার তৈরি করে নিতে পেরেছে। সে নীলক্ষেতে গিয়ে *কবিতার ক্লাস* বই কিনে এনেছে। সারাক্ষণ কবিতা পড়ে। পড়ে বোঝার চেষ্টা করে, ছন্দ কী।

সানাউল্লাহ রুমেই ছিল। সে গোসলে যাবে। তার আগে গায়ে সরষের তেল মাখছে।

এই কারণে গোটা হলে তার নাম 'সরিষা সানা' হয়ে গেছে। তবু সানাউল্লাহর সরষের তেল মাখার ব্যাপারে উৎসাহের বিরাম নাই। সে বলে, পৃথিবীর অর্ধেক অসুখ থেকে তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে, যদি তুমি গোসলের আগে নাভিতে সরিষার তেল মেখে নাও। এই তথ্য সে কোথায় পেয়েছে কে জানে!

তবু মাকসুদারের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হলো এই সানাউল্লাহ। কারণ সে-ও কবি। সে-ও কবিতা লেখে।

কবিতার কামড়ে অস্থির যুবা এই ক্যাম্পাসে তো বেশি নাই। সানাউল্লাহ সেই মুষ্টিমেয়দের একজন, যাকে একটা কবিতা উৎসর্গ করে বলা যায়, যেমনটা আবুল হাসান বলেছিলেন নির্মলেন্দু গুণকে, 'আমরাই তো একমাত্র কবি।'

মাকসুদার রাহমান বলে, 'দোস্ত, কী লাইন লিখেছে, দ্যাখ। শামসু হালায় একটা জিনিয়াস।'

সানাউল্লাহ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'আমার হাতে সরিষার তেল। তোর বইয়ের পাতায় লাগাইতে চাই না। তুই পইড়া শোনা।'

এই সময় ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী তাপস বৈশ্যর প্রবেশ।

'এই এই, চলো মিছিলে, যাবা না?'

মাকসুদার বলে, 'এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়/ এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়... কিন্তু আমরা যারা কবি, তারা তো অন্য ফ্রন্টে লড়াই করব। সবাই তো এক ফ্রন্টে লড়াই করবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। আমরা কবিতা লিখব।'

সানাউল্লাহ বলে, 'কিন্তু কবিতাকে তো যা কিছু কবিতা নয় তা থেকেও রক্ষা করতে হবে।'

মাকসুদার বলে, 'আমাকে যুদ্ধে যেতে হবে এই জন্য যেন আর কাউকে কোনো দিনও যুদ্ধে যেতে না হয়...'

তাপস বলে, 'কোন পাগলের পাল্লায় পড়লাম রে বাবা। তোমরা থাকো তোমাদের কবিতা নিয়ে। আমি মিছিলে গেলাম।'

তাপস মিছিলে চলে যায়।

সানাউল্লাহ সরষের তেল মেখে গোসল করতে চলে যায় বাথরুমের দিকে। টানা বারান্দার দুদিকে গণবাথরুম। লুঙ্গি আর তোয়ালে নিয়ে সানাউল্লাহ দখল করে একটা বাথরুম। লাইফবয় সাবান মাখে গায়ে-মাথায়।

মাকসুদার বুঁদ হয়ে কবিতা পড়ে চলে।

মাকসুদারকে কবি করেছে আর্কিটেকচারের এক মেয়ের মুখ।

মেয়েটার সঙ্গে তার দেখা নগরবাড়ি ঘাটে।

তারা একই ফেরিতে উঠে নদী পার হচ্ছিল। সিরাজগঞ্জের ছেলে মাকসুদার আর রাজশাহীর মেয়ে মৌটুসি। তারা একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে।

মৌটুসি পড়ে আর্কিটেকচারে।

মাকসুদার পড়ে সিভিলে।

মাকসুদার এসেছে নিপাট গ্রাম থেকে। তারা স্কুলে গেছে লুঙ্গি পরে। সেই লুঙ্গি পরা নিয়েও কত মজার কাহিনি যে আছে। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় তাদের ক্লাসের নুরু একদিন অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার অভিনয় করল। ক্লাসে ধপাস করে পড়ে গেল। ক্লাসে তিনটা মেয়ে ছিল। তার শুশ্রূষা করতে শুরু করল তারা। মেয়েদের স্পর্শ পেয়ে তো নুরুর শরীর সাড়া দিতে শুরু করে দিল। লুঙ্গি পরার বিপদ এই যে মেয়েরা সেটা টের পেয়ে গেল। মেয়েরা সবাই লজ্জা পেয়ে হাসতে লাগল মুখে ওড়না চেপে ধরে।

মৌটুসির বাবা রাজশাহীর পিডাব্লিউডির ইঞ্জিনিয়ার। তাদের বাগানঘেরা বাড়ি। তারা রাজশাহী শহরে চলাচল করে জিপগাড়ি চড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু মাকসুদারকে কবি করে তুলতে একদিন নিয়তি তাদের একই ফেরিতে তুলে দেয়।

তাদের বাস ছিল আলাদা আলাদা।

দুটো বাস একই সময়ে নগরবাড়ি ঘাটে এসে পৌঁছায়।

এবং একই ফেরিতে উঠে পড়ে।

মাকসুদারের সঙ্গে ছিল থার্ড ইয়ারের আফসান ভাই। তিনিও সিরাজগঞ্জের। তাবলিগ করেন। তিনিও আর্কিটেকচারেই পড়েন। দাড়ি রেখেছেন, টুপি পরেন, মাঝেমধ্যে চিল্লায়ও যান।

মাকসুদার আর আফসান ভাই ফেরির তিনতলার ছাদে বসে চা খাচ্ছিল। সেই সময় মৌটুসি ছাদে ওঠে, ওড়না ওড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে ওড়ায় মাকসুদারের হৃদয়।

কারণ, মৌটুসি পরেছিল একটা হলুদ রঙের কামিজ, আর ছিল সাদা ওড়না। ওই হলুদ রংই বোধ করি মাকসুদারকে আকৃষ্ট করেছিল।

সে চোখে চোখে মেয়েটিকে অনুসরণ করছিল।

আশ্চর্য, মেয়েটি তাদের কাছে আসে এবং আফসান ভাইকে সালাম দিয়ে বলে, 'আফসান ভাই, কেমন আছেন?'

মাকসুদার হাঁ করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে, সে আফসান ভাইকে ঈর্ষা করে। মেয়েটি বেশ লম্বা, চার কোনা মুখমণ্ডল, হালকা-পাতলা, গায়ের রং গমের দানার মতো, তার গজদন্ত, একটা দাঁতের ওপরে আরেকটা দাঁত ওঠানো। তার চুল খোঁপা করা, চুলে একটা উলের কাঠির মতো কাঠি।

তার চিবুকের মাঝখানটা কাটা।

আফসান ভাই মুখ নিচু করে বলে, 'ভালো আছি। তুমি ঢাকা যাও?'

মেয়েটি হেসে বলে, 'জি না, তেঁতুলিয়া যাই।'

আফসান ভাই রসিকতা বুঝতে পারেন না। বলে, তেঁতুলিয়া তো এই দিকে নয়।

মৌটুসি বলে, 'আরে, ফেরি নগরবাড়ি থেকে আরিচা যাচ্ছে, কালকে আমাদের ভার্সিটি খুলবে, আপনি ঢাকা যাচ্ছেন, আমি কি নোয়াখালী যাব নাকি?'

আফসান ভাই বোকার মতো বলেন, 'তাও তো কথা!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৌটুসি বলে, 'নিচে যাই, মা আবার চিন্তা করবেন।'

মৌটুসি চলে গেলে মাকসুদার জিগ্যেস করে, 'মেয়েটা কে?'

'ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে।' আফসান ভাই অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দেন।

'নাম কী?'

'মৌটুসি।'

মাকসুদার ঠিক সেই মুহূর্তেই কবি হয়ে যায়। সে মনে মনে আবৃত্তি করে, হলদে পাখি মৌটুসি, গায় সে গান মৌ চুষি...

কেন আবৃত্তি করে সে এই পঙ্‌ক্তিগুলো, জানে না।

কোত্থেকে এই লাইনগুলো এল তার মাথায়, এটাও তার জানা নাই।

সে তখনই কবি হয়ে যায়। ফলত সে সেদিন ঢাকায় পৌঁছে রাতে এই লাইন দুটো লিখে ফেলে।

এর পরের তিন মাসে সে একশটা কবিতা লিখে খাতা ভর্তি করে ফেলে।

তখন তার হুঁশ হয়। সে বুঝতে পারে, তার পিঠে একজোড়া ডানা আছে।

সে আকাশে উড়তে চায়। সে উড়তে চায়, কিন্তু পারে না। কারণ, ওড়ার কায়দা তার জানা নাই। সে তখন কবিতা লেখার কায়দা রপ্ত করতে চায়।

সে নিউ মার্কেট যায়। কবিতা লেখার নিয়মকানুন-সংবলিত বইপত্র কিনে আনে। কবিতার চর্চা করে। তখনই সানাউল্লাহর সঙ্গে তার খাতির হয়। কারণ, সানাউল্লাহর লেখা কবিতা একটা স্মরণিকায় ছাপা হয়েছে, সে দেখতে পায়। সে সানাউল্লাহর কাছে যায়। তারা কবিতা নিয়ে আলোচনা করে। তারা কবি হতে চায়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হলো তাদের কবি হওয়ার কারখানা।

একদিন সরিষা সানা বলে, 'আমার ফার্স্ট ক্লাসও লাগবে। আবার কবি হওয়াও লাগবে।'

মাকসুদার ঘোষণা করে, 'আমার কবি হওয়া লাগবে। আমি ফার্স্ট ক্লাস চাই না।'

মাকসুদারের কবিতাগুলোর বেশির ভাগই মৌটুসিকে নিয়ে। কিন্তু মৌটুসি সেটা জানে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকসুদারের তা দরকারও নাই। সে কবি হতে চায়, এবং সে জানে, কবি হওয়ার জন্য ব্যর্থ প্রেম দরকার। সফল মানুষ কোনো দিন কবিতা লিখতে পারে না। শিল্প ব্যর্থতা খুব পছন্দ করে। বস্তুত মৌটুসিকে যে-কথাগুলো সে কোনো দিনও বলতে পারবে না, তা বলার জন্য কবিতা লেখা শুরু করলেও আস্তে আস্তে তার কাছে কবিতা নামের অধরা শিল্পদেবীই প্রধান আরাধ্য হয়ে উঠতে থাকেন। শুধু যে মৌটুসিকে নিয়েই সে কবিতা লেখে তা নয়, আরও নানাজনকে নিয়ে লেখে এবং যাদের বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নাই, তাদেরও সে কবিতার বিষয় করে তোলে। কিন্তু মৌটুসি কথাটা ঘুরেফিরে আসে। এটা আবার সে করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুকরণে। সুনীল যেমন সারাক্ষণ 'নীরা' 'নীরা' করেন। নীরার অসুখ হলে কলকাতা বড় দুঃখে থাকে। সকালবেলা রোদ উঠলে সবাই জেনে যায়, আজ নীরার মন ভালো আছে। তেমনি কবি মাকসুদার রাহমানের আছে একজন মৌটুসি। সে যখন বড় কবি হবে, তখন লোকে তাকে জিগ্যেস করবে, কে এই মৌটুসি, তখন মাকসুদার মৃদু মৃদু হাসবে। স্পষ্ট করে কোনো জবাব দেবে না। সে তো একদিন সাঁওতালপাড়ায় একটা মেয়েকে দেখেও কবিতা লিখেছিল। মেয়েটি তার খোঁপায় কচুরিপানার ফুল পরেছিল। মৌটুসি, তোমার ফুলের প্রশংসা করতেই হয়, যেমন তোমার সুপুরিগাছের মতো হিলহিলে শরীরের—সে লিখেছিল—মৌটুসি, তোমার কালো শরীর আমি একবার দেখেছিলাম কদমডালে। সেটা তো আর আর্কিটেকচারের মৌটুসি ছিল না। কিন্তু কবিদের এই রকমই করবার নিয়ম। মদ সত্য, পাত্র সত্য নয়। প্রেম সত্য, প্রেমিক সত্য নয়। কবির সকলই আছে, একাগ্রতা নেই।

কিন্তু একটা বাস্তবতাকে সে অস্বীকারও করতে পারে না। মৌটুসি নামের মেয়েটা এই ক্যাম্পাসেই আছে। এবং সে মেয়েদের হলেও থাকে। মেয়েদের হলটা ভিসির বাসার পেছনের দিকে, বুয়েটের খেলার মাঠের ধারে। পুরোনো একটা ছোট্ট দোতলা ভবন। মেয়েদের নতুন ভবন হবে, এই রকম শোনা যাচ্ছে। কাজ এখনো শুরু হয়নি। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়ে পড়ে খুব কম। যা আছে, তা ওই আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টেই।

মৌটুসিকে মাঝেমধ্যে দেখা যায় তো! সিভিল বিল্ডিং থেকে ক্লাস করে মাকসুদার যখন হলের দিকে আসে, হঠাৎ করে তার চোখে পড়ে যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৌটুসিকে। একদিকে সিভিল বিল্ডিং, সুন্দর নকশা করা ৬ তলা, আরেকদিকে ইএমই বিল্ডিং, মানে ইলেকট্রিকাল অ্যান্ড মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ভবন, সাদামাটা কাঠামো—দুই ভবনের মধ্যখানের পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মৌটুসিকে দেখে মাকুসদারের নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হয়। তার সমস্ত শরীর রক্তশূন্য হয়ে যায়। মৌটুসির কোনো ভাবান্তর নাই। মৌটুসি তো জানেও না যে মাকসুদার তাকে নিয়ে কবিতা লেখে। মাকসুদার নামের এই তরুণ নবীন কবিটির জন্মদাত্রীর নাম মৌটুসি, কিন্তু মৌটুসি তা জানে না।

কবি শামসুর রাহমানের কবিতার বইয়ে এই লাইনটা পেয়ে মাকসুদার তাই আরেকবার ছুটে গিয়েছিল সানাউল্লাহর কাছে—অনিদ্রা আমার শত্রু, তবু তার শত্রুতাই ঠেকে সহনীয়, কেননা নিশ্চিত জানি, তুমিই জননী অনিদ্রার।

সকাল ১১টায় একটা বিরতি হয় ক্লাসের। আধঘণ্টার বিরতি। এই সময় অনেক ছেলেমেয়ে ক্যাফেটেরিয়ায় যায়। আলুর চপ আর চা খায়। ঢাকার স্থানীয় ছেলেরা বসে আড্ডা দেয়, তাস খেলে। টেবিল চাপড়ে গান করে। মাকসুদার এই সময়ে ক্যাফেতে যায় না। কারণ, ওটা আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টের কাছাকাছি। আর মৌটুসি ওই সময় ক্যাফেটেরিয়ায় যাবে, এটা খুব স্বাভাবিক। মৌটুসিকে নিয়ে কবিতা লেখা সহজ, নিজের টেবিলে বসে ঘাড় গুঁজে লিখে ফেললেই হলো, কেউ তো দেখছে না, কেউ তো জিগ্যেস করে বসছে না যে মৌটুসিটা কে? কিন্তু মৌটুসির মুখোমুখি হওয়া সত্যিই কঠিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত ব্যাগ গোছাচ্ছে। বেশি কিছু নেবার দরকার নাই। সে বেশি দিন থাকতে চায় না। বাবা তাকে কেন ডেকেছেন, সে জানে না। বাবার যদি সত্যি সত্যি অসুখ করে থাকে, তাহলে শওকত কী করবে, সে জানে না। টিউশনি করে জমানো টাকা কটা সে সঙ্গে নেয়। বাবার চিকিৎসার জন্য লাগতে পারে। বাবার কি সত্যি কোনো অসুখ করেছে? বাবা কি মারা যেতে পারেন?

হঠাৎ করে শওকতের সমস্ত অস্তিত্ব ভেঙে কান্না আসতে থাকে। হায় হায়, বাবা তো মারা যেতে পারেন। তার বাবা মারা যাবেন? বাবার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা শওকতকে ঘিরে। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক বাবা তাঁর মেয়েদের কাছে কিছু আশা করেননি। সব আশা তাঁর ছেলেকে নিয়ে। সেই ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে, সেটা না দেখেই কি তিনি মারা যাবেন?

বাবা তাঁকে একদিন বদরগঞ্জ থেকে রংপুর রাস্তার মাইলফলক দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাইলপোস্ট দেখে নাম্বার শিখেছিলেন। আমি চাই, তুমি বিদ্যাসাগরের চেয়েও বড় হবে। তুমি হবে বিদ্যামহাসাগর।'

বাবার পাঞ্জাবির ঘাড়ের কাছে ডাবল করে কাপড় দেওয়া। পাঞ্জাবি ছেঁড়ে ঘাড়ের কাছে। তা ঠেকাতেই দর্জিরা এই বুদ্ধি বের করেছে। ঘাড়ের কাছে তারা দুই পরত কাপড় দেয়। বাবার পাঞ্জাবির ভেতরে একটা গোপন পকেট থাকে। পকেটমারেরা যেন পকেট কাটতে না পারে, সেই জন্য বাবার এই সতর্কতা।

শওকত দরজা বন্ধ করে দেয়। তার হলের রুমে এখন কেউ নাই। ছেলেরা বেশির ভাগই মিছিল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছে। সেখান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে তারা যাবে সচিবালয়ের দিকে। শিক্ষাভবন ঘেরাও করবে। মাঝখানে খবর এসেছে, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে জড়ো হয়েছে। মিছিল খুবই বড় হবে। আজ সিএমএলএ এরশাদের গদিই না পড়ে যায়! ফাঁকা রুমে শওকত বাবার কথা ভেবে বেশ খানিকটা কেঁদে নেয়। বুকটা কিছুটা হাল্কা হয়।

শওকতের কাছে তার ক্লাসমেট হাসানের একটা বই আছে। লাইব্রেরির বই। হাসান থাকে সোহরাওয়ার্দী হলে। বইটা হাসানের কাছে ফেরত দিতে ওই হলে যাওয়া দরকার। শওকত চোখের পানি মোছে। বইটা নিয়ে সে সোহরাওয়ার্দী হলের দিকে এগোয়।

নজরুল ইসলাম হলের পেছনের গেট দিয়ে আসে সাত্তার মিয়ার দোকানের সামনে। হল বেশ ফাঁকা ফাঁকা। ছেলেরা বেশির ভাগই গেছে শিক্ষাভবন ঘেরাও করতে।

আহসানউল্লাহ হলের সামনের রাস্তায় এসে সে নিজের ছায়ার দিকে তাকায়। তখন ঘুরে সে একবার সূর্যের দিকে তাকিয়ে ভাবে, বাতাস এত চড়া কেন? বসন্ত আসছে বলে, নাকি আন্দোলনের তাপ লেগেছে বাতাসে?

এই সময় একটা মেহগনিগাছে কোকিল ডেকে ওঠে।

তার মনে হয়, আন্দোলনেরও একটা আবহাওয়া আছে, রোদের দিকে তাকালেই তা অনুভব করা যায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সয়লাব ছাত্রছাত্রীতে। হাজার হাজার শিক্ষার্থী জড়ো হয়েছে সেখানে। কলাভবন এলাকায় ছাত্রসভা হয়। তারপর মিছিল এগোতে থাকে বাংলা একাডেমির সামনে দিয়ে দোয়েল চত্বরের দিকে। কার্জন হলের পাশ দিয়ে শিশু একাডেমী পেরিয়ে মিছিল ঘেরাও করবে শিক্ষাভবন।

এত বড় মিছিল সাম্প্রতিক কালে আর দেখেনি ঢাকাবাসী।

মিছিলের পুরোভাগে শত শত ছাত্রী।

তাদের হাত মুষ্টিবদ্ধ, তাদের চোখের প্রতিজ্ঞায় ইস্পাত-কঠিন, তাদের স্লোগান গগনবিদারী।

মিছিলের এক মাথা যখন হাইকোর্টের সামনে, আরেক মাথা তখনো ছাত্রশিক্ষক কেন্দ্রে। পুরো রাস্তার ডান পাশ থেকে বাম পাশ, এমনকি ফুটপাত পর্যন্ত বিক্ষোভকারীতে ভরা। মানুষ আর মানুষ। যেন বর্ষাবিস্ফারিত যমুনা, দুই তীর উপচে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে সাগরের দিকে।

হাইকোর্টের মোড়ে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়েছে। কাঁটাতারের প্রতিবন্ধক। সারি সারি পুলিশ প্রস্তুত অস্ত্র উঁচিয়ে। রায়ট ভ্যান আনা হয়েছে, জলকামান তৈরি গরম রঙিন পানিসমেত।

সামরিক বিধি ভঙ্গ করে মিছিল বেরোবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুর রহমান ঢাকা জেলা সামরিক আইন প্রশাসক। তিনি হুকুম দেন—'ফায়ার।'

গুড়ুম গুড়ুম গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে দরদালান, আকাশ-বাতাস। পুলিশ হুইসেল বাজায়, লাঠিচার্জ করে, সামনে যাকে পায় তাকেই পেটাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে। কোনটা গুলি, কোনটা কাঁদানে গ্যাসের শেল আলাদা করা যায় না। কাঁদানে গ্যাসের শেল সামনে এসে পড়লে ছেলেরা সেটা কুড়িয়ে নিয়ে উল্টো ছুড়ে মারে পুলিশের দিকেই।

ছেলেরা স্লোগান দেয়, ছেলেরা ঢিল ছোড়ে, একযোগে পিছায়, আবার একযোগে এগিয়ে যায় ঢিল ছুড়তে ছুড়তে।

তখন পুলিশ পেছাতে থাকে।

ভাঙা ইটের টুকরায় পুরো রাস্তা সয়লাব।

আবার পুলিশের ব্যারিকেডের ওই পাশে গুলির খোসায় ঢেকে যায় রাজপথ।

বুয়েটের ছাত্ররা দলে দলে ফিরে আসে হলে। রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধ চলছে। ছাত্রজনতা ইটপাটকেল ছুড়ছে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুড়ছে। লাঠিচার্জ করছে। তারপর গুলি চালাচ্ছে। ছত্রভঙ্গ বুয়েটিয়ানরা যে যেভাবে পারে নিজেদের জান নিয়ে পালিয়ে আসে। কেউ আর খায়। কাঁদানে গ্যাসে কারও চোখ জ্বলে শেষ। হাবিবও আসে। আহসানউল্লাহ ক্যানটিনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জরুরি সভা বসেছে। এখন কী করা কর্তব্য।

নানা কথা শোনা যাচ্ছে। সত্য-মিথ্যা আলাদা করা যাচ্ছে না।

শিশু একাডেমীতে তখন বাচ্চাদের প্রতিযোগিতা হচ্ছিল। দীপালি সাহা নামের একটা মেয়ে এসেছিল ঢাকার বাইরে থেকে। এই রকম অনেক ছেলেমেয়েই এসেছিল সেখানে। গুলি শুরু হলে ছাত্ররা শিশু একাডেমীর ভেতরে আশ্রয় নেয়। সেদিকে গুলি ছোড়া হলে দীপালি মারা যায়। আরও আরও শিশু মারা গেছে। এই রকম খবরই আসে।

বহু লাশ পড়েছে।

উত্তেজিত ছাত্ররা এসে এসে খবর দিচ্ছে। জাফর জয়নাল দীপালি সাহা আয়ুব ফারুক কাঞ্চন—শহীদের নাম ভাসতে থাকে বাতাসে। পুলিশ লাশ গুম করে ফেলছে—লাশ কেড়ে নিতে হবে—নানা ধরনের কথা কান থেকে কানে ছড়ায়।

লড়াইয়ের গরমে ফেব্রুয়ারির শৈত্য ক্যাম্পাস থেকে উধাও।

দুটো সৈন্যভর্তি ট্রাক যাচ্ছিল সোহরাওয়ার্দী হল তিতুমীর হলের পাশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাস্তা দিয়ে। ছেলেরা হলের ছাদ থেকে সেই ট্রাক লক্ষ্য করে ঢিল-পাটকেল মারতে থাকে।

আর সৈন্যরা হলের ভেতরে ঢুকে পড়ে। রুমে রুমে গিয়ে যাকে সামনে পায়, তাকেই পেটাতে থাকে।

কবি মাকসুদার রাহমান চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে বেরোয় তিতুমীর হল থেকে। দোতলার সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে তার সামনে পড়ে দু-তিনজন উর্দিধারী। তাদের একজন রাইফেলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মারে মাকসুদারকে। মাকসুদার পালাতে চায়। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গেলে সে রেলিংয়ে বাড়ি খায় এবং তার একটা দাঁত পড়ে যায়। দাঁতটা কুড়িয়ে নিয়ে উল্টো দিকে দৌড়ে সে সোজা চলে যায় ছাদে। ছাদের পেছনে পানির ট্যাংকের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নেয় সে।

তখন একঝাঁক কাক পানির ট্যাংকের ওপরে বসে তাকে আড়াল করে রাখে।

বন্ধুকে বই ফেরত দিতে গিয়ে ধাওয়ারত পুলিশের সামনে পড়ে শওকত। সে উল্টো দিকে দৌড়ানোর চেষ্টা করলে পিঠে একটা বাড়ি এসে পড়ে। সে ধপাস করে রাস্তায় পড়ে যায়। তার ওপর দিয়ে বুট মাড়িয়ে পুলিশেরা সামনের দিকে এগোলে সে উপুড় হয়েই পড়ে থাকে। বাঁচার সহজাত প্রবণতায় মাটি ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে সে বোঝে, তার পা ভেঙে গেছে। কিন্তু কোত্থেকে শক্তি এসে ভর করে তার শরীরে সে জানে না, সে আর্কিটেকচার ভবনে একটা নির্মাণাধীন লিফটের ফোকরে ঢুকে বসে থাকে। তার পিঠ বেয়ে রক্ত ঝরে। কিন্তু সে নিজের কথা না ভেবে বুয়েটের আর্কিটেকচারের মনজু নামের ছাত্রটির কথা ভাবতে থাকে। মনজু এই ভবনের ছাদে উঠেছিল এবং লিফটের ফোকরে কী আছে দেখার জন্য পা বাড়িয়েছিল। সেখানে কিছুই ছিল না বলে মনজু চারতলা থেকে নিচে পড়ে যায়। দুপাশে লোহার শিক হাঁ হয়ে বেরিয়েছিল মনজুকে গাঁথবে বলে, কিন্তু নিয়তি মনজুকে শিকগুলোর ভেতর দিয়ে নিরাপদে নিচতলায় পতিত হতে দেয়। নিচতলায় লিফটের ফোকরে দরজার জায়গায় ছিল ইটের দেয়াল। তার ভেতরে আহত কিন্তু সচেতন মনজু চিৎকার করে বলতে থাকে, এই কে আছিস, আমি লিফটে পড়ে গেছি। দেয়াল ভাঙ, আমাকে উদ্ধার কর। সেই ডাক নিয়তি ও তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধুরা শুনতে পায়, দেয়াল ভেঙে মনজুকে উদ্ধার করা হয়। সেই মনজু যেহেতু বেঁচে আছে, সেহেতু লিফটের এই ফোকর শওকতকেও বাঁচতে দেবে বলে শওকতের প্রতীতি হয়। গুলির শব্দ বুটের শব্দ পুলিশের হুইসেলের শব্দ কমে এলে শওকত লিফটের ফোকর থেকে বেরিয়ে কর্মচারীদের সাহায্যে বুয়েটের হাসপাতাল কাম ক্লিনিকে ভর্তি হয়। সারা শহরে লড়াই ছড়িয়ে পড়ে। রক্ত, বুলেট, কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ, লাশগুম, কান্না, চিৎকার, প্রতিবাদ, আগুন, ঢিল-পাটকেলের মধ্যে আসে সামরিক ফরমান, ক্লোজড সিনে ডাই।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আজকের মধ্যেই সবাইকে হল ছেড়ে দিতে হবে।

ভেঙে যাওয়া দাঁতটা একটা খামে পুরে নিয়ে মাকসুদার বাসের সন্ধানে বের হয়।

গাবতলীতে গিয়ে তার জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি সে ঘটতে দেখে।

মৌটুসিও ব্যাগসমেত গাবতলী বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রথম সে সাহস করে মৌটুসির দিকে এগিয়ে যায়।

'তুমি কি টিকিট পেয়েছ?'

'না। পাই নাই।'

'তাহলে কী করবা?'

'বুঝতেছি না।'

'আমিও টিকিট পাই নাই। আমি ভাবছি, আরিচার বাসে উঠে পড়ব। আরিচা গিয়ে ফেরি করে না হলে লঞ্চে নদী পার হব। তারপর আবার লোকাল বাস ধরব।'

'আপনি কই যাবেন?'

'আমি সিরাজগঞ্জ যাব। তুমি তো যাবা রাজশাহী, না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু নগরবাড়ি থেকে রাজশাহীর বাস পাওয়া যাবে?'

'যাবে।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ঢাকা শহরে কারফিউ দেওয়া হবে শোনা যাচ্ছে। ঢাকা আর নিরাপদ না। আর দলে দলে ছাত্ররা এসে গাবতলী ভরিয়ে তুলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি মাকসুদার রাহমান বলে, 'চলো, বাসে উঠে পড়ি।'

এই সময় রাজশাহীর ছেলে আরও দুজন এসে পড়ে। তারাও বলে, 'চলো, আরিচার বাসে উঠি।'

মাকসুদারের জীবনের শ্রেষ্ঠ সাফল্য, মৌটুসির সঙ্গে সে একই বাসে উঠে একই দিকে যায়।

মাকসুদারের পকেটে তখনো সৈন্যদের পিটুনিতে খুলে পড়া তার দাঁতের ভগ্নাংশ।

বাসের ভেতরে ঠাসাঠাসি-গাদাগাদি করে যায় তারা। বাসের পেছনের দিকে দুই পাশের আসনের মধ্যবর্তী জায়গায় একদল বসে পড়ে।

মাকসুদার বসে ইঞ্জিন কভারের ওপরে। তাতে তার সুবিধা হয়। তার পাশেই লেডিস সিটে বসে আছে মৌটুসি। মৌটুসির পা তার পায়ের কাছে পড়েছে।

মাকসুদারের সমস্ত চেতনা একজোড়া পায়ের সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

সে নির্মলেন্দু গুণের কবিতা থেকে আবৃত্তি করতে থাকে :

তোমার পায়ের কাছে আমিও অমর হব
আমাকে কী মাল্য দেবে দাও।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকসুদার, মৌটুসি, আরও আরও বুয়েটিয়ান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বাস থেকে নামে। তখন অনেক রাত। আরিচাঘাটের রাস্তার দুপাশের দোকানঘরগুলোয় তখন আলো জ্বলছে। হকারদের দোকানে দোকানে গনগনে কেরোসিনের কুপিবাতি। ঘন কুয়াশাও পড়েছে নদীর ঘাটে।

ঘাটে ফেরি নোঙর করা আছে। ছেলেমেয়েরা ফেরিতে উঠে পড়ে।

মৌটুসির চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। এভাবে বেরিয়ে পড়া উচিত হয় নাই। ঢাকায় তার আত্মীয়স্বজন আছে।

তারা সবাই ফেরির ওপর নীল রঙের নকল ঢেউটিনের ছাদের নিচে বসা।

ফেরি চলছে। মাথার ওপরে বাতি জ্বলছে।

মাকসুদার বলে, আকাশে একটা চাঁদও আছে বোধ হয়। কুয়াশার কারণে দেখা যাচ্ছে না।

সে তার ব্যাগ থেকে একটা কবিতা সংকলন বের করে।

মৌটুসির হাতে দিয়ে বলে, 'এর মধ্যে আমার লেখা কবিতা আছে।'

ফেরির ছাদে ঝুলন্ত লাইটে মাকড়সার জালে লটকে আছে পোকা। দু-একটা পোকা উড়ছে। আলো অপ্রচুর, কিন্তু মৌটুসির পড়তে অসুবিধা হয় না।

স্বয়ং তার হাতে কবিতাগুলো, যাকে নিয়ে এসব লেখা, মাকসুদার রাহমানের সমস্ত অস্তিত্ব নড়ে ওঠে। তার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। এই মেয়েটিকে নিয়ে সে কবিতা লেখে, এটা সে জানাতে চায় না কাউকে। মেয়েটিকেও নয়। মেয়েটি তার তুলনায় আকাশের চাঁদ এবং সে রীতিমতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বামন। এই মেয়ে যদি জিগ্যেস করে বসে, 'আপনি আমাকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন কেন?'

এই প্রশ্নের উত্তর তার জানা আছে। টি এস এলিয়ট বলেছিলেন, কবিরা হলো সেই চোরের মতো, যারা দরজায় এক টুকরা মাংস রাখে, যাতে কুকুর বাইরে চলে আসে, আর তারা ভেতরে ঢুকতে পারে। মানে কবির কাজ আসলে হলো একটা দেখিয়ে আরেকটা উদ্দেশ্য হাসিল করা। মাকসুদারও তা-ই করতে চেয়েছে। মৌটুসি তো একটা উপলক্ষ মাত্র। তার আসল লক্ষ্য শিল্প রচনা করা।

তার দেবী আসলে মৌটুসি নয়। তার দেবী বাগ্‌দেবী।

কিন্তু এই কথাটা মাকসুদার তাকে কখনো মুখ খুলে বলতে পারবে না। মাকসুদার এই মেয়েটির সামনে এলেই বোকা বনে যায়। তার হাতের তালু ঘামে। তার মুখ শুকিয়ে যায়। তার বুক ধড়ফড় করে। এখন তারা দুজন যে একই ছাদের নিচে আছে, এইটাই তো একটা আশ্চর্য। মেয়েটা কবিতা পড়ে। বলে, ভালো লিখেছেন। মৌটুসি নামটা ব্যবহার করেছেন দেখি।

অতি কষ্টে মুখ থেকে শব্দ বের করে মাকসুদার বলে, 'হ্যাঁ, মৌটুসি একটা পাখির নাম।'

শুনে মেয়েটা যেন হতাশ হয়। শরীর ছেড়ে দিয়ে বলে, 'ও...'

মাকসুদারের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে।

যাক, মৌটুসির সামনে সে কোনো বিব্রতকর অবস্থায় পড়েনি। মৌটুসিকেও সে বিব্রত করেনি।

মৌটুসি বলে, 'নগরবাড়ি ঘাটে গিয়ে যদি বাস না পাই তাহলে কী হবে?'

মাকসুদার বলে, 'তাহলে খুবই মুশকিল হবে। আমাদেরকে নগরবাড়ি ঘাটে সারা রাত থাকতে হবে।'

শীত খুব বেশি। ঘাটের দোকানে কীভাবে ওরা থাকবে? আর বাথরুম ইত্যাদিই বা কোথায় সারবে!

মুশকিল হলো, মাকসুদার রংপুরের একটা বাস পেয়ে গেছে ফেরিতেই। ইঞ্জিনের ঢাকনার ওপরে বসে সে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত যেতে পারবে। কিন্তু মৌটুসি রাজশাহীর কোনো বাস পায়নি। এখন মৌটুসিকে ছেড়ে সে যেতে তো পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৌটুসির একটা হিল্লে না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মাকসুদার। যদি মৌটুসি সারা রাত নগরবাড়ির কোনো ভাতের রেস্টুরেন্টে চেয়ারে বসে কাটিয়ে দেয়, তো মাকসুদারও তা-ই করবে।

ফেরি কুয়াশাচাদরে ঢাকা ঘুমন্ত যমুনা পেরিয়ে নগরবাড়ি ঘাটে পৌঁছায়। তারা সবাই ফেরির নিচতলায় ঠাসাঠাসি করে দাঁড় করানো বাসগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে ঘাটে নামে।

একে একে বাসগুলো সব চলে গেলে জায়গাটা শূন্য হয়ে পড়ে।

তখন মাকসুদারের বুকের ভেতরটাও কেমন যেন ব্যথা-ব্যথা লাগে। রেলগাড়ি চলে যাওয়ার পর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের শূন্যতা নিয়ে সে একটা কবিতা লিখবে। এটা সে মনে মনে ভাবে।

তাদের দলটা বেশ বড়।

তারা একটা ভাতের হোটেলে টেবিল ঘিরে বসে।

চা খায়। ডিম খায়। কেউ কেউ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে কুয়াশাঢাকা রাতটাকে আরও ধূসর করে তোলে।

মৌটুসি বিশেষ কিছু বলে না।

মাকসুদার বিশেষ কিছু বলে না।

এই সময়ে দুজন লোক আসে—'এই তো আপা, এইখানে। আপা, গাড়ি নিয়া আসছি। চলেন যাই। ইউনিভার্সিটি বন্ধ শুনে স্যারে বুলল, যাও, গাড়ি নিয়ে নগরবাড়ি যাও। আমি রাজশাহীর গাড়িগুলায় আপনেরে খুঁজলাম। এখন দেখি আপনি এখেনে।'

মৌটুসি উঠে চলে যায়।

মাকসুদারসহ ছেলেমেয়েরা রয়ে যায় নগরবাড়িতেই। ওই ভাঙাচোরা রেস্টুরেন্টটাতে। ডিম-পরোটা ভাজা হচ্ছে। কাস্টমার আসে। চলে যায়। ঝিমায়।

মাকসুদারের ফাঁকা বুকটা ভরে যাচ্ছে। কুয়াশায়। জ্যোৎস্নায়। এতক্ষণ তার অস্বস্তি হচ্ছিল। এখন আর হচ্ছে না।

তার এক বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসি বিভাগের মালেক বলে, 'দোস্ত, এই মেয়েটার জন্য না তুই রংপুরের বাস ছাড়লি। আর সে গাড়ি পেয়ে তাতে উঠে চলে গেল। তোকে নিয়ে গেল না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেমন করে নিবে? আমরা এতজন না? আর ও তো যাবে রাজশাহী।'

কথাটা সে কেনই বা বলল। তারা সংখ্যায় কম হলে মাকসুদারকে সে গাড়িতে নিত। নিয়ে কত দূরই বা যেত। সিরাজগঞ্জের পথ রাজশাহীর পথের থেকে একসময় আলাদা হতোই।

আজ দুজনার দুটি পথ ওগো দুই দিকে গেছে বেঁকে।

শওকতের পায়ে প্লাস্টার করা। সে বুয়েটের ক্লিনিকের গাছে ঢাকা পুরোনো ভবনের প্রায়ান্ধকার ঘরে একা পড়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো খালি করে দিতে বলার পর একে একে ছাত্ররা সবাই হল ছেড়ে চলে গেছে। শওকতের কোথাও যাওয়া হয়নি। কারফিউ শুরু হয়ে গেলে এলাকাটা জনশূন্য হয়ে পড়ে। বুয়েটের আহত ছাত্ররা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হলেও পুলিশের ভয়ে যে যেখানে পারে সটকে পড়েছে। শওকতেরও বেরিয়ে পড়া উচিত। পুলিশ এখানেও আসতে পারে। শওকত ছাড়াও এই ক্লিনিকে ভর্তি হয়ে আছে হিমেল ভাই নামের একজন। তার জন্ডিস হয়েছে।

হিমেল ভাই চলাফেরা করতে পারেন। জন্ডিসের চিকিৎসা বলতে তো শুধুই বিশ্রাম।

হিমেল ভাই শওকতের কাছে আসেন এবং তার সেবাশুশ্রূষা করেন।

এবং তিনি ঘটনার নানা রকমের ব্যাখ্যা শোনান।

হিমেল ভাই সম্পর্কে শওকতের আগে কোনো ধারণা ছিল না।

হিমেল ভাই-ই গল্পে গল্পে ধারণা দেন।

হিমেল ভাই একজন বিখ্যাত রিপিটর। মানে বছরের পর বছর তিনি ফেইল করে আসছেন। কবে ভর্তি হয়েছিলেন বুয়েটে, এটা তার মনে নাই।

শওকত বলে, 'এটা কোনো কথা হলো, হিমেল ভাই। আপনি কবে ভর্তি হইছেন, এটা আপনার মনে থাকবে না।'

হিমেল ভাই বলেন, 'এইটাই তো কথা। কথা দুই প্রকার। একটা হলো কথা, আরেকটা হলো কথার কথা। আমারটা হলো কথা।'

'আপনার কেন মনে থাকবে না আপনি কবে ভর্তি হইছেন?'

'তুমি কবে জন্মাইছিলা, তোমার মনে আছে?'

'আমার জন্মসাল তো আমি জানি। ১৯৬৩ সালে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে তোমার জন্মসালের কথা কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে। তুমি যে মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীর মাটিতে বা ডাক্তারের টেবিলে ল্যান্ড করলা, এইটা তোমার মনে আছে?'

'এটা কি মনে থাকার কথা?'

'তাইলে আমি বুয়েটে কত সালে ভর্তি হইছিলাম, এটাও আমার মনে থাকার কথা না?'

'আচ্ছা। তাইলে আপনি পাস করেন না কেন?'

'আরে মিয়া। এইটা হইল বুয়েট। এখানে পাস করা কি যা-তা কথা? ফাঁকি দিয়া পাস করা যায়?'

'আপনি ফাঁকি দেন কেন?'

'আরে, আমি ফাঁকি দিছি সেইটা তোমাকে কে বলল?'

'দেন নাই ফাঁকি?'

'না। আমি পাস করতে চাই। কিন্তু পারি না। এইটা আমার ব্যর্থতা।'

'তাইলে আপনি ক্যাম্পাস ছেড়ে যান না কেন?'

'আরে মিয়া, ক্যাম্পাস ছেড়ে যাব কই? এখানে বিনা পয়সায় হলে থাকতে পাই। হলের খাওয়া সস্তা। বুয়েটে পড়ি শুনলে মানষে পাত্তা দেয়। ছাত্রত্ব চলে গেলে আমার গতিটা হবে কী?'

'আপনি আরও কত বছর থাকবেন বলে ঠিক করছেন?'

'না না। পাস করে ফেলব।'

'আপনার চলে কেমন করে?'

'টিউশনি করি।'

'কী টিউশনি করেন। ব্যবসাপাতি শুরু করেন। বড়লোক হয়ে যান।'

'আরে, কী বলো। টিউশনি করার মতো আরাম আর কিছুতে আছে, বলো। মনে একটা শান্তি আসে। কী? না, আমি জ্ঞানের আলো বিতরণ করছি।'

'তা ঠিক। আপনি জ্ঞান বিতরণ করছেন।'

'শোনো শওকত। আজকে খুশির খবর আছে। তোমার ভাবি আসবেন। নানা কিছু রান্না করে আনবেন। আমার তো জন্ডিস। আমার তো কিছু খাওয়ার উপায় নাই। তুমি খাবা। বুঝলা?'

'জি। বুঝলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। একটু ঘরটা ছেড়ে বাইরে থাকতে হবে। বোঝো তো, তোমার ভাবি আসবেন। আমরা খানিকক্ষণ কনজুগাল লাইফ লিড করব।'

'জি আচ্ছা।'

'শোনো। এই যে এরশাদ মিয়া ছাত্রদের মাইর দিল, এর পরিণতি তুমি কী দেখো?'

'আমার বাবার অসুখ। আমি বাড়ি যেতে পারতেছি না। বাবা মনে হয় মারা গেছে, হিমেল ভাই।'

'কেঁদো না। নানস ফাদার লিভস ফর এভার। আমাদের সবার বাবা মারা যাবেন। আজ হোক আর কাল হোক। তবে তোমাকে বলি, আমাদের সমাজটা হলো আধা সামন্তবাদী আধা পুঁজিবাদী সমাজ। দেখবা, সচিবের খাটের নিচে পিঁয়াজ রাখা। এইটা হলো আধা সামন্তবাদের লক্ষণ। সচিব কেন পেঁয়াজ রাখবে? কারণ সে বুর্জোয়াও ঠিকমতো হইতে পারে নাই। কিন্তু ছাত্ররা প্রতিবাদ করল কেন? বলো। সাম্প্রদায়িক শিক্ষানীতি হইলে ছাত্রদের লাগে কেন? এই ব্যাখ্যাটা দাও।'

ভাবি চলে এসেছেন। তিনি শাড়ি পরে সেজেগুজে এসেছেন। তাঁর হাতে টিফিন ক্যারিয়ার। নানা রকমের খাবার এনেছেন। ভাবি বোধ হয় মুখে অতিরিক্ত রং মেখেছেন। মুখটা দেখাচ্ছে সাদা ধবধবে।

তিনি শাড়ি পরেছেন পাতলা। ব্লাউজ পরেছেন লাল। পাতলা শাড়ির আঁচলের নিচে তার সাদা ব্রা ফুটে আছে। শওকত চোখ সরায়।

হিমেল ভাই বলেন, 'শওকত, খাওয়া একটু পরে হবে। তুমি বারান্দায় বসো। আমি চেয়ার দিচ্ছি।'

শওকত বারান্দায় বসে। বড্ড মশা। সে বসে বসে মশা মারছে। ভাঙা পা নিয়ে সে কোথাও যেতেও পারছে না।

হিমেল ভাই দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

বাইরে অন্ধকার নেমে আসছে।

ভেতরে ঘরে আলো জ্বলছে। জানালার পর্দা জানালার তুলনায় ছোট।

বাইরে থেকে ভেতরের অনেক কিছুই দেখা যাচ্ছে।

এদিকে কেউ আসে না।

বিপরীত দিকের জানালার কাচে ঘরের প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত সেই কাচের ছায়ায় অ্যাডাল্ট মুভি দেখে।

তার একবার পাপবোধ হয়। হিমেল ভাই ও তাঁর বিবাহিত স্ত্রীর দাম্পত্যক্রীড়া কি তার দেখা উচিত?

একবার সে চোখ বন্ধ করে। আরেকবার খোলে।

তার নিজেরই শ্বাস ঘন হয়, বুক ধুকপুক করে।

ভাবি তো বেশ সক্রিয় আছেন, এই ভাবনা আসতেই সে চোখ ফিরিয়ে নেয়। নাহ্। সে আর দেখবে না। পাপের হাতছানিতে সে সাড়া দেবে না। তার দেওয়া উচিত নয়।

ফেব্রুয়ারি তার ঠান্ডা নিয়ে জেঁকে বসতে চাইছে। ফাল্গুন এসে গেছে। এক মাঘে শীত যায় না।

সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে মিশে কড়ইগাছের ডালে বসে একটা কোকিল সেই বার্তাই যেন রটিয়ে দিতে চায়।

এক মাঘে শীত যায় না।

এক ফেব্রুয়ারির লড়াইয়ে স্বৈরশাসন হটানো যায় না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামা এসে হাজির ক্লিনিকে। বলেন, 'তোর খোঁজে হলে গেছলাম। হলের দারোয়ানরা বলল, তুই ক্লিনিকে। পা ভেঙে তো ভালোই আছিস। বাড়িতে তোর বাবার অসুখ। শুনেও গেলি না কেন?'

'যাবার প্রস্তুতি নিছলাম মামা।' শওকত তার প্লাস্টারের গায়ে আঁচড় কাটতে কাটতে বলল, 'যাব বলেই বের হইছিলাম, তখনই পুলিশ আর্মি অ্যাটাক করে বসল।'

'তোর বাবাকে তো মনে হয় তুই আর দেখতে পাবি না।'

'আমি এরশাদকে কোনো দিনও ক্ষমা করতে পারব না, মামা। হি ইজ আ গণতন্ত্র হত্যাকারী। এখন হি কিন্তু মাই ফাদার।'

'ইংরাজি বলতেছিস কেন?'

'বাবা আমাকে ইংরেজি শিখাইছেন, মামা। হি টট মি টু স্পিক ইন ইংলিশ। দিস ইজ মাই ট্রিবিউট টু মাই লেট ফাদার। দিস ইংলিশ কনভারসেশন ইজ মাই ট্রিবিউট টু মাই ফাদার।'

মামা শওকতকে জড়িয়ে ধরেন। শওকত হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে।

মামা বলেন, 'ডোন্ট ক্রাই, মাই চাইল্ড। ডোন্ট ক্রাই।'

আশ্চর্য, মামা নিজেও কাঁদেন এবং নিজেও ইংরেজি বলতে থাকেন।

কান্না এবং ইংরেজি কথন—দুই-ই দেখা যাচ্ছে সংক্রামক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামার জোগাড় করা মাইক্রোবাসে মামা আর শওকত যাচ্ছে বদরগঞ্জের দিকে। শওকতের পায়ে এত বড় প্লাস্টার। সে তার বাম পা সটান করে রেখেছে। সঙ্গে একটা ক্রাচ।

সারা রাত গাড়ি চলল। কুয়াশা, অন্ধকার। পথের দুপাশে গাছ। তারা এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন তোরণ সাজিয়ে রাখা। গাড়ি ছুটছে। গাছপালা পেছাচ্ছে।

সমস্ত চরাচর ঘুমোচ্ছে। মামারও নাক ডাকার শব্দ গাড়ির শব্দ ভেদ করে কানে আসে। শুধু ড্রাইভার আর শওকত জেগে থাকে।

তার হু হু করে কান্না আসে।

বাবা যে মারা গেছেন এই ব্যাপারটা একেবারে নিশ্চিত। তা না হলে মামা তাকে মাইক্রোবাস ভাড়া করে নিয়ে যেতেন না।

আহ্। সংসারের দায়িত্ব কি এখন থেকে তাকে নিতে হবে? বোনেদের বিয়ে হয়েছে। মা একা একা ঘরদোর সামলাতে পারবেন?

বাবার কথাই মনে পড়ে।

বাবাকে চিরটাকাল বুড়োই দেখেছে শওকত। অন্তত বয়স্ক দেখেছে। সে তার বাবা-মার বেশি বয়সের সন্তান। একটা ছেলে নেওয়ার আশায় বাবা-মা তিন মেয়ের পরও বেশি বয়সে আরেকটা সন্তান নিয়েছিলেন।

বাবা তাকে জিলিপি কিনে খাওয়াতেন। গুড়ের জিলিপি তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল। শেষের দিকে বাবার ডায়াবেটিস হয়েছিল। বাবা মিষ্টি খেতে পারতেন না। একদিন তিনি কী করলেন, শওকতকে হাটে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'বাবা, জিলাপি খাও।'

'বাবা, তুমিও খাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না বাবা। তুমি খেলেই আমার খাওয়া হয়ে যাবে।'

শওকত জিলিপি খাচ্ছে। বাবা তাকিয়ে আছেন। আজ শওকত বুঝতে পারছে বাবা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন এ জন্য যে শওকতের মিষ্টি খাওয়ার মধ্য দিয়েই তার নিজের মিষ্টি খাওয়া হয়ে যেত। আহা রে, তার সহজ-সরল বাবাটা। তিনি কি মারাই গেলেন।

বাবা, প্লিজ মারা যেয়ো না। আমি আসছি। মাইক্রোর সিটে পা মেলে বসে থেকে শওকত বলতে থাকে মনে মনে। তার দুগাল বেয়ে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরছে।

ভোরবেলা মাইক্রোবাস বদরগঞ্জের পথ ধরে। এই পথে সাধারণত গাড়ি চলে না। লোকজন হাঁ করে তাকিয়ে আছে। শওকত বুঝে যায়, গ্রামবাসী আহা আহা করছে। মাস্টার সাহেবের ছেলেটা আজ আসিল। দুই দিন আগে আসতে পারল না। তাইলেই তো মাটিটা পাইত!

সেই চেনা পথ। চেনা পাকুড়গাছের তিরতির করে কাঁপা পাতা। ঢোলকলমির জঙ্গল। শটিবন। বাজে পোড়া তালগাছ। সেই জরাজীর্ণ জঙ্গলে ছাওয়া পরিত্যক্ত বাড়ির শ্যাওলা পড়া খুলে যাওয়া ইট। শটিবনে দৌড়ে ছুটে যাওয়া শেয়াল। কুয়াশামোড়া ভোর।

গাড়ি বাড়ির পেছনে পগাড়ের পারে থামে। আর যাবে না গাড়ি। এতটুকুন পথ হাঁটতে হবে। গ্রামবাসী ছুটে আসে। ছুটে আসে বড় বোনেরা।

তাকে জড়িয়ে ধরে তারা কাঁদতে থাকে।

শওকত বলে, বাবা কই।

বাঁশঝাড়ের নিচে তার কবর।

খেজুর-ডাল পোঁতা। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঢাকা।

মামা আর শওকত কবরের পাশে দাঁড়ানো।

মামা বলেন, 'গোসল করে এসে জিয়ারত করব। চলো, ভেতরে চলো।'

মা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছেন।

শওকত আরেকটু থাকবে এই কবরের পাশে।

পাতা ঝরছে। বাঁশপাতা। ভোরের শিশিরসমেত।

আমার বাবা এখানে শুয়ে কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত ডুকরে কেঁদে ওঠে। তার বগলে ক্রাচ।

দূরে তাই দেখে মা-ও কেঁদে ওঠেন।

পুরো বাড়িতে একটা কান্নার রোল পড়ে যায়।

মা বিলাপ করতে থাকেন, 'সেই তা আসিলা বাবা, দুই দিন আগেই আসিতা। লোকটা ভালোই আছিল। রাইতের বেলা ভালো মানুষটা ভাত খাইয়া শুতিল। দুধ-ভাত খাইল। আমি কই, গুড় নিবা। বলে, "না, আমার তো ডায়াবেটিস। গুড় কেন নিব।" শুইয়া রোজ ঘুম পাড়ে। সেই দিন কী হইল। বলে, "শওকতের মা, শওকতকে নিয়া আমার বড় আশা। ইঞ্জিনিয়ার হইলে তো ধরো জিপগাড়ি পাইব। এই বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি আসার রাস্তা করা লাগে। বাড়ির পিছনের চিকন রাস্তাত মাটি কাটিয়া বড় করা লাগে।" ভালো মানুষটা শুতিল। মাঝরাতে বলে, "শওকতের মা, আমার জানি বুকটা কেমন কেমন করে। খুব বেদনা।" আমি বলি, সরিষার তেল গরম করি দিব। কিসের কী। বলতে বলতে মানুষটা নাই। সময় দিল না। কষ্ট পায় নাই। ধপ করি পড়ি মরি গেছে। কাউরে কষ্টও দেয় নাই।'

শওকত ভাবে, বাবার কি তাহলে হার্ট অ্যাটাক করল, নাকি ব্রেন স্ট্রোক!

বাবা কত বছর বাঁচলেন? ৫৪ নাকি ৫৬? সে নিজে কত বছর বাঁচবে?

দাদাও নাকি ৫০ বছর বেঁচেছিলেন।

তারও কি সময় এগিয়ে আসছে দ্রুত?

বাবা তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া দেখে যেতে পারলেন না, সেই দুঃখ আবারও গ্রাস করে শওকতকে। সে মাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরশাদ ভ্যাকেশন। পুরো হল ফাঁকা। হলে কেউ নাই, এটা দেখার জন্য পুলিশের গোয়েন্দারা আসে। এর মধ্যেই আবীর চলে এসেছে হলে। দারোয়ানকে পুরো পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে বখশিশ। সে হলে গিয়ে তার রুমে ওঠে।

কারণ শানু আসতে চেয়েছে।

শানু আসে।

তার পরনে সালোয়ার-কামিজ।

সে ঠোঁটে লাল রঙের লিপস্টিক দিয়েছে। গ্লসি।

শানুকে রুমে নিয়ে আসে আবীর।

পুরো হলে আর কেউ নাই।

শুধু একটা বন্ধ কক্ষে শানু আর আবীর।

আবীর আর শানু গল্প করছে।

শানুর শরীর থেকে পারফিউমের পাগল করা গন্ধ আসছে।

পাশাপাশি বিছানায় বসে আছে তারা। আবীরের পাগল পাগল লাগছে।

শানু বলে, 'আজকে আমার হাত দেখে দাও।'

আবীর তার হাত নিজের হাতে তুলে নেয়। আঙুলের ফাঁকে আঙুল।

শানু তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমাকে আদর করো অ্যাবস।'

আবীর তার দিকে মুখ বাড়িয়ে দেয়।

শানু লতার মতো পেঁচিয়ে ধরে আবীরকে।

আবীর বলে, 'জামাটা নষ্ট হচ্ছে। খুলে রাখো।'

শানু জামা খোলে।

সমস্ত ঘরটা যেন জোছনায় ভরে যায়। এত আলো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবীর বলে, 'তোমার তলপেটে এটা কিসের দাগ?'

'সেলাইয়ের। সিজারিয়ান বেবি হয়েছে আমার।'

'তোমার বেবি আছে?'

'হ্যাঁ। দুজন।'

'তোমার বিয়ে হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার স্বামী আছে?'

'হ্যাঁ।'

'সেই গল্প তো করো নাই কখনো।'

'কারণ, সে গল্পে আসার যোগ্য না।'

আবীর কী করবে বুঝতে পারে না।

শানু বলে, 'কাম অন ডারলিং...' সে নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়। আবীর অনুগতের ভূমিকা পালন করে।

শানু বলে, 'কী ব্যাপার? তুমি মন দিচ্ছ না কেন? শোনো, সেক্স ব্যাপারটা কিন্তু শরীরের নয়। মনের। তুমি কী ভাবছ?'

আবীর বলে, 'কই, না তো। আমি তো কিছুই ভাবছি না।'

শানু বলে, 'আমি তোমার মন পড়তে পারি, আবীর। আমার স্বামী আছে ছেলে আছে তো কী হয়েছে। আমি শুধুই তোমার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠোনে বসে মা রান্না করছেন। মাটির চুলা। উঠোনেই বানানো। ফাল্গুন মাস। এখনো বৃষ্টি শুরু হয়নি। এই রকম সময়ে মা খোলা আকাশের নিচে রান্না করতেই পছন্দ করেন। চেলা কাঠের জ্বালানি। কলাপাতা, আখের ছোবড়া, সরষে গাছের শুকনো ডাল, বাঁশের কঞ্চিও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বাঁশের চোঙের ফুঁকনি দিয়ে মা চুলার আগুনে ফুঁ দেন। মার গালটা ফুলে ওঠে। আগুন জ্বলে উঠলে তার লাল আভা মার মুখে পড়ে। মার চুল পাকা। সেই পাকা চুলে এসে পড়ে পোড়া ছাই।

সূর্য ডুবে গেছে বাঁশঝাড়ের আড়ালে খানিক আগে। আকাশে এখনো গনগন করছে অস্তরাগ। স্থির মেঘের গায়ে বিচিত্র রং। মা মাগরিবের নামাজ শেষ করে চুলা নিয়ে লেগে পড়েছেন। টিউবওয়েলের পাড়ে গিয়ে এটা-ওটা ধুচ্ছেন। বঁটিতে বসে তরিতরকারি কুটছেন। তাকে সাহায্য করছে মর্জিনার মা।

শওকত ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে চুলার পাশে গিয়ে একটা ছোট্ট টুলে মায়ের পাশে বসে।

তার এই মা আস্তে আস্তে বুড়ো হয়ে গেলেন। আর সে-ও বড় হয়ে কীভাবে মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। ক্রমাগত দূরে সরেই যাচ্ছে।

এই মায়ের সঙ্গে তার কি আর কোনো যোগাযোগ আছে। কথা বলার মতো অভিন্ন বিষয় আছে?

অথচ মায়ের গায়ের গন্ধ তার কতই না ভালো লাগত।

মায়ের শাড়িতেও মায়ের গন্ধ লেগে থাকত।

মাত্র ১২ বছর আগে, মাত্র ১০ বছর আগে সে ছিল মা-নেওটা। তিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোনের পর ছেলে পেয়ে মা-বাবা দুজনেই তাকে কত আদর করতেন।

এখন সে পড়ে বুয়েটে। তার জগৎ আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

মা বলেন, 'বাবা, তোর পায়ের প্লাস্টার কবে কাটা লাগবে?'

শওকত একটা পাটকাঠি হাতে ভাঙতে ভাঙতে বলে, 'এই তো মা। আর দুই দিন। রংপুর মেডিকেলে যাব। গিয়ে কেটে নিয়ে আসব প্লাস্টার।'

'তোর পা ভাঙল। তোর বাবাও চলি গেল। সব বিপদ একসাথে আসে।' মা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

'হ্যাঁ মা। তবে আমার পা ভেঙে ভালোই হয়েছে। তোমার সাথে থাকা হচ্ছে। তোমার হাতের রান্না খাওয়া হচ্ছে। তোমার এই যে বেগুন দিয়ে পুঁটি মাছের চচ্চড়ি, এইটা কি আর ঢাকার হোস্টেলে পাওয়া যায়।'

'তোদের কলেজ কবে খুলবে?'

'কলেজ না, মা। বিশ্ববিদ্যালয়। খুলে যাবে শোনা যাচ্ছে। তবে ডেট দেয় নাই।'

'শোন। তুই কিন্তু কোনো গন্ডগোলের মাঝে যাবি না। মিছিলে যাবি না। তোর বাবা ছিল মাস্টার। এলাকায় তার একটা সম্মান আছে। আর আমরা গরিব মানুষ। তোর একটা কিছু ক্ষতি হলে কিন্তু আমার আর কোনো গতি থাকবে না।'

'ঠিক আছে, মা। আমি মিছিলে যাব না। যাই না তো।'

'আর এরশাদ রংপুরের লোক। তার বিরুদ্ধে লাগার দরকার কী?'

'মা। আমিও তো রংপুরের। তার লোক এসে আমার পা ভেঙে দিল কেন?'

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'আল্লাহর কাছে বিচার দে। আল্লাহ বিচার করবেন, বাবা।'

বাবার মৃত্যুর পরের দিনগুলো কীভাবে কেটে গেল। ভাঙা পা নিয়েই গ্রামের মসজিদে মিলাদের ব্যবস্থা করতে হলো। বোনেরা দুলাভাইরা এসেছিলেন বাড়িতে। তাদের ছেলেমেয়েরা। পুরা বাড়ি গমগমে।

যাবার আগে বোনেরা বাবার জুতা, শাল, ঘড়ি ভাগ করে নিয়ে গেল। বলল, এসব বাবার স্মৃতি। বাবার স্মৃতির ওপরে তাদের অধিকার আছে।

শওকত মোটেও আপত্তি করল না।

তবে বোনেরা এখনো সম্পত্তির ভাগ চায় নাই। বড় দুলাভাই শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইঙ্গিতে বললেন, 'জমিজমা যা আছে, শওকত তো আর কোনো দিন গ্রামে আসবে না, ভাগ-বাঁটোয়ারা করে না দিলে আশপাশের লোকেরা সব দখল নিয়ে নিবে। মা যত দিন আছে, মারও তো খাওয়া-পরা লাগবে। তবে এরা তিন বোন আছে, আমরা জামাইরা আছি, শওকত আছে। মার কি আর খাওয়ার অভাব হবে? শওকত, তুমি দেখো, জমিজমা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে কাগজপত্র পাকা করে ফেলো। তোমার নামে, বোনেদের নামে ইসলামি ল অনুযায়ী সবকিছু ঠিকঠাক করে নাও। তা না হলে তুমি ঢাকা যাবা। ভাগীদাররা বেদখল করে ফেললে আর কিছু করার থাকবে না।'

শওকত এই সব কথায় তেমন গা করে নাই।

তবে সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে, খুব ঘটক আসা শুরু হয়েছে বাড়িতে। তার কাছে সম্বন্ধ আসছে। তাকে বিয়ে দিয়ে দিতে চায়।

শওকত সবকিছু হেসে উড়িয়ে দেয়।

রংপুর মেডিকেল কলেজে গিয়ে প্লাস্টার কেটে নিয়ে আসে শওকত। পা একটু বাঁকা হয়ে গেছে। ডাক্তার বলেন, 'আপাতত আরও কিছু দিন ক্রাচ নিয়েই চলুন। পরে নিজেই বুঝতে পারবেন কখন ক্রাচ ছাড়বেন।'

'বাঁকাটা কি ঠিক হবে না?'

'হবে আশা করা যায়। দেখেন, হাঁটতে হাঁটতে যদি ঠিক হয়।'

শওকতের মনটা একটু দমে যায়। সে কি তাহলে এখন থেকে খোঁড়া শওকত হয়ে গেল।

এখন থেকে ঘটকেরা কি বলাবলি করবে, পাত্রের সব ভালো। শুধু একটা খুঁত আছে। পাত্র ল্যাংড়া।

বিশ্ববিদ্যালয় এখনো খোলেনি। খোলার কথাবার্তা চলছে।

শওকত ঠিক করে, ঢাকায় চলে যাবে। হলে গিয়েই উঠবে। ডাক্তার দেখাবে। পা যদি ঠিক হয়! আর টিউশনি আবারও চালু করতে হবে। টিউশনি করলে তার টাকা আসবে। তার কোনো চিন্তা থাকবে না।

শওকত ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয় বিকালবেলা।

রোদে চড়া বসন্তের বিকাল।

হলদেটে আলো দিগন্তজোড়া।

তাদের টিনের চালের ওপর আমগাছে আমের মুকুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠোনে মুরগি চড়ছে। একটা কুকুর চুলার পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে।

একটা রিকশাভ্যান এসেছে শওকতকে ঢাকা-সৈয়দপুর রোড পর্যন্ত নিয়ে যাবে। সেখান থেকে লোকাল বাসে সে যাবে রংপুর। তারপর নাইট কোচে উঠে পড়বে।

মা তাকে নানা কিছু বোঝা বানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। টিফিন ক্যারিয়ারের বাটিতে চালের আটার রুটি আর হালুয়া। মুরগির মাংস আর পরোটা। পলিথিনের প্যাকেটে মুড়ির মোয়া। শওকত একবার ভাবে মাকে বলে, 'মা, এগুলো দিয়ো না তো।' কিন্তু তারপর ভাবল, না, থাকুক, নিয়ে যাই সঙ্গে করে। মা একধরনের শান্তি পাবেন।

রিকশাভ্যানে ওঠার আগে সে মাকে জড়িয়ে ধরে।

আহা। মায়ের শরীরের সেই গন্ধ।

সে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছে। মা এখনই কাঁদতে শুরু করবেন। বাবার কথা বলে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদবেন। এই ধরনের বিদায় সে চায় না। সে বলে, 'মা, আসি। দোয়া কোরো।'

মা চোয়াল শক্ত করে বলেন, 'যাও বাবা। দেখেশুনে যাও। গিয়ে চিঠি লিখো। ভালোভাবে থেকো। সাবধানে থেকো।'

রিকশাভ্যান চলতে শুরু করে।

আমগাছে কোকিল ডাকছে।

মা বেড়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

শওকতও মায়ের দিকে মুখ করেই বসে আছে।

কাঁচা রাস্তার ওপরে বাঁশঝাড়ের কঞ্চিগুলো হেলে পড়ে আছে।

ঘুঘু ডাকছে।

শালিক চরছে।

একটা সময় রাস্তাটা বাঁক নেয়। মা আড়াল হয়ে যান ঝোপঝাড়ের।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও একজন দুজন ছেলে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে হলের রুমে।

আবীর থাকে।

এখনো সে সারা রাত ফোনে কথা বলে শানুর সঙ্গে।

শানুর দুটো ছেলে আছে। একটার বয়স ৫, একটার ২। এই তথ্য জানার পর আবীর খানিকটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল বটে। এখন অবশ্য বাচ্চা দুটোর নাম ওর মুখস্থ। পরশ আর পৃথ্বী।

পরশ ইংরেজি স্কুলে কেজি ওয়ানে পড়ে।

পৃথ্বী এখনই পাকা পাকা কথা বলে।

আবীর বলে, 'শানু, তোমার হাজব্যান্ড তো দেখতে হ্যান্ডসাম। মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। সিঙ্গাপুরে থাকে। তুমি আমার মতো খ্যাত টাইপ ছেলের পেছনে কেন লেগে আছ?'

শানু আল্লাদি গলায় বলে, 'আমার খ্যাতই পছন্দ। আমি তো মেরিন ইঞ্জিনিয়ার স্বামী চাই নাই।'

'কত হ্যান্ডসাম দেখতে।'

'তোমার মতো না।'

'ও মা। এটা কি তুলনা করার বিষয়। তোমার স্বামীর চেয়ে আমাকে তোমার হ্যান্ডসাম লাগে। আমার চেয়ে আরেকজনকে তোমার হ্যান্ডসাম বেশি লাগবে। তখন তুমি ওই ছেলের পেছনে ছুটতে থাকবে? এটা কি কিছু হলো?'

শানু বলে, 'আরে, আমি সব ছেলের পেছনে ছুটি নাকি। *বিচিত্রায়* তোমার ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লিখেছি। তুমি জবাব দিয়েছ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রমিতালি থেকে ফোনালাপ। সেখান থেকে প্রেম। আমার কি সারা পৃথিবীর সব হ্যান্ডসাম ছেলের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ানোর শখ নাকি?'

শানু রোজ আসে। সকাল ১১টায় তার ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে হয়। এই সুযোগে সে ৯টার দিকে চলে আসে হলে। ১০টা-১১টা পর্যন্ত তারা একসাথে থাকে।

রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আলিঙ্গন। চুম্বন।

১৫ মিনিটের মধ্যে তারা আত্মহারা।

তারপর শানু নিজেকে গোছায়। সেফটিপিনগুলো কুড়িয়ে নেয়। চুল আঁচড়ায়।

ঠোঁটে লিপস্টিক দেয় হাতব্যাগ থেকে ছোট্ট আয়না বের করে নিয়ে।

তারপর বিদায় নেয়।

ইদানীং সে নতুন বুদ্ধি বের করেছে।

বোরকা পরে আসে।

বোরকা পরেই বেরিয়ে যায়।

শানু চলে যাবার পর আবীরের শুরু হয় ক্ষণগণনা। রাত ১১টার দিকে সে আবার এক ব্যাগ কয়েন নিয়ে বসবে কয়েন বক্স টেলিফোনের পাশে। মেলা রাত ধরে কথা হবে।

সকালবেলা আবার আসবে শানু।

এই রকম কেন হয়। কেন শানুকে ছাড়া তার একদণ্ড ভালো লাগে না?

একদিন শানু আসে আবীরের হলে। যথারীতি ঘরে এসে বসে।

মুখটা শক্ত করে বলল, 'আবীর সোনা, তোমার সাথে আমার একটা কথা আছে।'

আবীর হাসিমুখে বলল, 'মাত্র একটা কথা? বেশি করে কথা বলো।'

শানু বলল, 'ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস।'

'কী?'

'আই অ্যাম ক্যারিয়িং।'

আবীর ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না? চোখ সরু করে তাকায়।

'আমার তো এ মাসে হয় নাই। টেস্টিং কিট এনেছি। টেস্ট করলাম। পজিটিভ দেখাচ্ছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী বলো? কী করবা?'

'বাচ্চা রেখে দেব?'

'তোমার হাজব্যান্ড কী বলবে?'

'ও বুঝতে পারবে না। মাঝখানে এক সপ্তাহ ছিল তো ঢাকায়।'

'তাইলে তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন?'

'কিন্তু বাচ্চা ওর নয়।'

'কী করে বুঝলা?'

'ওর সঙ্গে সেফ পিরিয়ডে হয়েছে। তোমার সঙ্গে ডেঞ্জারাস সময়ে।'

'কী জানি। আমি তো এত কিছু বুঝি না।'

'তোমার হাজব্যান্ডকে বলেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কী বলে?'

'বলেছে, রেখে দাও। খুশিই হয়েছে। আমি একা একা থাকি। পেটে একটা বাচ্চা থাকা মানে ওর জন্য সেফটি আর সিকিউরিটি।'

'তুমি রেখে দিতে চাচ্ছ কেন?'

'কারণ, আমি তোমাকে ভালোবাসি। কারণ, তোমার বাচ্চা আমি পেটে ধরতে চাই। আমি তোমার বাবুকে বড় করতে চাই।'

আবীরের নিজেকে বিভ্রান্ত বলে মনে হয়। সে-ও শানুকে খুব ভালোবাসে। তাহলে তো পরিণতি একটাই দাঁড়াচ্ছে যে তার শানুকে বিয়ে করে ফেলা উচিত। কিন্তু এই কি তার বিয়ে করার বয়স? পাস করে কবে বেরোবে কিছুই তো ঠিক নাই। এরশাদ ভ্যাকেশনে ভ্যাকেশনে তো কম্ম কাবার।

সে শানুকে জড়িয়ে ধরে। তার তলপেটে চুমু খায়। তার নিজের অস্তিত্বের একটা সম্প্রসারণ, তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটার শরীরের ভেতর বেড়ে উঠছে। কী আশ্চর্য। কিন্তু পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কেমন একটা এলোমেলো বাতাস, গাছের ডালে দমকা হাওয়ার ঝাপটা যেন...

সে শুধু বলতে থাকে, 'আই লাভ ইউ, শানু।'

শানু কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'তুমি কোনো দিনও আমাকে ছেড়ে চলে যেয়ো না। কোনো দিনও না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তপু হলে আসে একটা সাদা রঙের টয়োটা চড়ে। তার বাবা চিফ ইঞ্জিনিয়ার, পানি উন্নয়ন বোর্ডের।

তার পরনে থাকে হালকা নীল রঙের জিনসের ট্রাউজার। গায়ে সাদা রঙের লিনেনের শার্ট। তার উচ্চতা ছয় ফুট। তার গাড়ির স্টিয়ারিং বাম হাতে ধরা। ডান হাতে সিগারেট। জানালার কাচ নামিয়ে সে ধোঁয়া ছাড়ে।

শহীদ স্মৃতি হলের লাল ইটের ভবনের সামনে চমৎকার নারকেলগাছে ঢাকা লন। সেখানে সে গাড়িটা পার্ক করে। ভেতরে তার জন্য একটা রুম বরাদ্দ আছে। সেখানে যায়।

মাঝেমধ্যে সে হলে এসে থাকে।

তখন তার মা-বাবা আর একটা ছোট্ট বোন আসে হলের গেটে। একটা সরকারি পাজেরো গাড়ি করে। বোনটা বোধ হয় ক্লাস সেভেন-এইটে পড়ে। তাকে খুকি-খুকি লাগে। এ সত্ত্বেও হলের বারান্দায় ছেলেরা উঁকিঝুঁকি করে।

নজরুল ইসলাম হল আর শহীদ স্মৃতি হলের ক্যানটিন অভিন্ন। তার শূন্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে শওকত দেখে, এই ছুটির মধ্যেও তপু এসেছে। সাদা গাড়িটা পার্ক করে সে নামল। পায়ে নাইকি কেডস। সে চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে ভেতরে ঢুকে গেল।

সাত্তার মিয়ার দোকানের সামনে এগিয়ে যায় শওকত। তারপর আরেকটু এগিয়ে গেল শহীদ স্মৃতি হলের সামনের নারকেলগাছগুলোর নিচে। শওকতের মনে হয়, এই ছেলে হলে কেন এসেছে। ঢাকায় তো তার থাকার জায়গা আছে।

এই রকম ফাঁকা হলে থাকা বিপজ্জনক। সরকারি গোয়েন্দা বিভাগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকেরা এসে খোঁজখবর নিয়ে যায়। হলে সরকারবিরোধী কোনো তৎপরতা চলেছে কি না ঢুঁড়ে দেখে। হলের ক্যানটিন বন্ধ। ডাইনিং বন্ধ। নাশতা করতেও বকশীবাজারে যেতে হয়। পপুলার হোটেল ভরসা।

মাঝেমধ্যে নীরব হোটেলেও যাওয়া চলে। অনেক ধরনের ভর্তাভাজি পাওয়া যায়।

তবে নীরব হোটেলে যাওয়ার পথটা একটু বিপজ্জনক। রিকশা যানজটে দাঁড়াতেই ছেলেরা এসে ডাকতে থাকে, এই বুলু বুলু। মানে পুরান ঢাকায় ভিসিআরে ব্লু ফিল্ম দেখানো হয়। বিশ টাকা করে টিকিট। কোনো একটা ঘরের মধ্যে মেঝেতে বসে থাকে দর্শকেরা। তারপর ফিল্ম চালু করে দেওয়া হয় টিভি পর্দায়। মাঝেমধ্যে পুলিশ তাড়া করে।

শওকত কোনো দিনও ব্লু ফিল্ম দেখতে যায়নি। সে শিক্ষক বাবার ছেলে। ঢাকা শহরে এসে সে নিজেকে নষ্ট করতে পারে না।

আজকে তপু কেন এসেছে হলে? ওকে গিয়ে জিগ্যেস করা যায়—শওকতের মনে হয়। ওই মনে হওয়া পর্যন্তই। ঢাকার বড়লোকদের ছেলেদের সঙ্গে সে ঠিকমতো মিশতে পারে না।

বিকাল হতে না হতেই সে বেরিয়ে যায়। ধানমন্ডিতে যেতে হবে। সেখানে সে একটা টিউশনি করে। দুই বোন একসাথে পড়ে তার কাছে। বড়টা নাইনে পড়ে, নাম লাবণী। ছোটটা পড়ে সেভেনে। নাম লামিয়া।

দুটোই ভালো ছাত্রী। পড়াশোনায় ভীষণ মনোযোগী। এদের পড়িয়ে শওকত আনন্দই পায়।

সেদিন ছোটটা বড়টার সামনেই জিগ্যেস করে বসল, 'স্যার, পাখিদেরও কি বিয়ে হয়?'

'এই প্রশ্ন তোমার মনে এল কেন?'

'বিয়ের পরে তো বাচ্চা হয় তাই না? আমাদের বারান্দায় চড়ুই পাখি বাচ্চা দিয়েছে।'

লাবণী তাকে ধমক দেয়, 'এই, চুপ। তোকে এত কথা বলতে কে বলেছে?'

আজকে সকালবেলার নাশতা শওকত ট্রিকসে ফেলেছে। দুপুর বারোটার দিকে খিদে পেয়ে গেল। গোসল সেরে সে চলল পপুলার হোটেলে। টাটকিনি মাছ আর ডাল দিয়ে ভাত খেলো। ধনে চিবুতে চিবুতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে ফিরে এল। এবার সে ঘুম দেবে। ঘুম থেকে উঠেই টিউশনিতে যেতে হবে।

কিন্তু তার ঘুম আসছে না।

পুরো বুয়েট ক্যাম্পাস ফাঁকা। আহসানউল্লাহ হল, শহীদ স্মৃতি হল, নজরুল ইসলাম হল। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নাই। হঠাৎই তার ভীষণ একা লাগে। মনে হয়, এই পৃথিবী বিশাল। আর সে এখানে একটা বিছানায় একা পড়ে আছে। তার মতো অসহায় আর কেউ নাই।

তার বাবা কোথায়?

বাঁশঝাড়ের নিচে ঠান্ডা মাটির বিছানায় ঘুমোচ্ছেন।

একবার বাবার সঙ্গে সে গিয়েছিল বারুনির মেলায়। কত রসুন উঠেছিল মেলায়। কত তরমুজ। গরুগাড়িগুলো সব মেলা প্রাঙ্গণের বাইরে ত্রিভুজের মতো করে রাখা। গাড়ির চাকার সঙ্গে গরুগুলো বাঁধা। বহুদূর থেকে মেলার মানুষের আওয়াজ গুনগুনানির মতো কানে আসছিল। আলপথে পিঁপড়ার সারির মতো লোক যাচ্ছে মেলার দিকে। তারপর কোলাহলটা বাড়ল। ভিড় বাড়ল।

শওকত আর বাবা ঢুকে পড়ল মেলায়। বাবার হাত ধরে রইল। ভিড়ের চোটে এগোনোই মুশকিল। বাবা তাকে একটা গাড়ি কিনে দিলেন। একটা লাঠির ডগায় একটা চাকা। চাকার ওপরে একটা প্রজাপতি। চাকা ঘোরালে প্রজাপতি পাখা নাড়ে।

বাবা বললেন, 'তুমি এই মিষ্টির দোকানে বসো। মিষ্টি খাও। আমি একটু তোমার মায়ের জিনিস কিনে আনি।'

শওকত বসে আছে। বাবা ফিরছেন না। তার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে, সে হারিয়ে গেছে। একটু পর তার চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় পানি পড়তে লাগল।

তারপর সে মুখ বিকৃত করে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল, 'বাবা, বাবা।'

মিষ্টির দোকানি বলছেন, 'বাবু, কাইন্দো না। বাবা আসিয়া পড়বে বাহে।'

আসে না কেন? কখন আসবে? শওকত আরও জোরে কাঁদে। তারপর বাবাকে দেখা গেল। দেখে তার ধড়ে জান ফিরে এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজও তার তেমনি মনে হচ্ছে। সে যেন মেলায় হারিয়ে যাওয়া বালক। তার বাবার হাতের আঙুল তার মুঠো থেকে ফসকে গেছে। তার বাবাকে সে আর কোনো দিনও ফিরে পাবে না। সে-ও পথ হারিয়ে ফেলেছে। সে-ও আর তার বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না।

শহীদ স্মৃতি হলের সামনের সবুজ লনের অযত্নে লালিত ঘাসের ওপরে শুয়ে পড়ে সে। নারকেলগাছের ফাঁক দিয়ে আকাশের বিস্তারিত শূন্যতার দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, সে বড় একা এবং তার বাবা আর কোনো দিনও ফিরে আসবেন না।

সে হাউমাউ করে কাঁদে।

একটা পিঁপড়া তার ঘাড় বেয়ে উঠে আসে গালের ওপরে। শওকত পিঁপড়াটাকে ডান হাতের আঙুলে তুলে নেয়।

তাকিয়ে তাকিয়ে সে পিঁপড়াটাকে দেখে।

একটা দলছুট পিঁপড়া। লাইনের বাইরে চলে এসেছে। এই পিঁপড়া পথ হারিয়ে ফেলবে। আর কোনো দিনও তার বাসায় ফিরে যেতে পারবে না।

শওকতের নিজেকে এই পিঁপড়ার মতো ছোট আর দলছুট বলে মনে হয়।

তবে পিঁপড়া কাঁদতে পারে না। মানুষ কাঁদতে পারে।

শওকত কাঁদে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহীদ স্মৃতি হলে পুলিশ এসেছে। শওকত টিউশনি সেরে ফিরছিল ক্যানটিনের পাশের রাস্তা দিয়ে। হলের গেটে পুলিশ দেখে ভড়কে যায়। সরকারের নির্দেশে হল ফাঁকা করে দেবার পর হলে পুলিশ আসা মানে বিপদ। শওকতকেও ধরে নিয়ে যেতে পারে পুলিশ। স্যাররা দেখলে তার সিট ক্যানসেল করে দিতে পারেন। সে সটকে পড়ে। নজরুল ইসলাম হলের গেট পেরিয়ে দ্রুত ঢুকে যায় নিজের রুমে।

সেখানেও তার কেমন ভয় ভয় লাগে। সে চলে যায় বকশীবাজারের দিকে। হেঁটে চলে যায় নীরব হোটেলে।

নীরব হোটেল পুরান ঢাকায়।

টেবিলে বসার পর বেয়ারা এসে বলতে থাকে, 'কলাভর্তা, আলুভর্তা, বেগুনভর্তা, শুঁটকিভর্তা, ডালভর্তা, শিমভর্তা, বরবটিভর্তা, টাকি মাছভর্তা, ইলিশ মাছভর্তা, চিংড়িভর্তা, গরুর ভুনা, ডাল খাসি, খাসির কলিজা ভুনা, খাসির মগজ, ডাল, পালংশাক, লালশাক, করলা ভাজি...'

শওকত বলে, 'আলুভর্তা, বেগুনভর্তা, শুঁটকিভর্তা আর গোরুর ভুনা আর ডাল।'

সে ভাত মাখে, আলুভর্তা ছানে, শুঁটকিভর্তা থেকে মুখে দেয়, কিন্তু তার মনে হয়, হলে ঢোকার পথেই সাদা পোশাকের পুলিশ তাকে ধরে ফেলবে জাপটে।

তারপর কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে নিজেকে আবিষ্কার করবে পুলিশের ট্রাকে।

ভাত খেয়ে মৌরি চিবুতে চিবুতে সে হলের কাছে আসে। না, কোথাও কোনো পুলিশ সে দেখতে পায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের হল ছাড়িয়ে সে চলে আসে শহীদ স্মৃতি হলের সামনে।

না, অস্বাভাবিক কোনো দৃশ্য নাই।

গেটের সামনের লাইটগুলো সাধ্যমতো আলো ছড়াচ্ছে।

দারোয়ান আলিমুদ্দি গেটের সামনে টুলের ওপরে বসে আছেন।

সে বলে, 'কী খবর, আলিমুদ্দি ভাই, পুলিশ এসেছিল কেন?'

আলিমুদ্দি বলেন, 'আর বইলেন না, স্যার। আপনারা নিজেরাও মরেন, আমাদেরও মারেন।'

'মানে কী?'

'তপু স্যারে তো তার রুমে মইরা পইড়া আছিল। লাশ পইচা গেছে। মাছি ভন ভন করতেছে।'

'তাই তো বলি, ওর গাড়িটা এখানে পড়ে ছিল কেন?'

'হ। মনে হয় সাত দিন আগে আসছে। একা একা দরজা বন্ধ কইরা কি-না-কি করছে। শুনলাম নাকি হেরোইন খাইছে। খাইয়া ঘুম দিছে। আর উঠে নাই। ওইখানেই মইরা পইড়া আছিল। ওনার বাবা-মা আসছে। দেখে বাইরে গাড়ি। তারপর রুমে গেছে। রুমে গিয়া চিল্লাচিল্লি করল। আমরা গেলাম ছুইটা। গিয়া দেখি দরজা বন্ধ। ভিতর থাইকা গন্ধ আসে। প্রভোস্ট স্যাররে ফোন করলাম। স্যাররা আসল। পুলিশ আসল। দরজা ভাঙা হইল। ভেতরে স্যারের লাশ পইড়া আছে। এখন পুলিশ তো আমাগো ধমক দেয়। তোমরা দেখো না। ভেতরে ঢুকল কেমনে? কী কমু স্যার, কন। আপনে যে আছেন, আমি আপনেরে আপনের হলের গার্ডে কইতে পারব স্যার ঢুইকেন না।'

'না, তা পারবে না।'

'তাইলে কন।'

'মারা গেল কেমনে?'

'কইলাম না হেরোইন খাইছে।'

'হেরোইন খাইলে মারা যায়?'

'জানি না তো, স্যার। খায়া তো দেখি নাই।'

শওকতের একটা দৃশ্য মনে পড়ে যায়। শহীদ স্মৃতি হলের বন্ধুর রুমের বারান্দা থেকে শওকত এই দৃশ্যটা দেখেছিল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তপু হলে থাকবে। ঢাকার ছেলে হলেও পরীক্ষার কটা দিন সে হলে থাকবে। তাকে বিদায় দিতে এসেছে তার বাবা-মা আর বোনটা।

মা ছেলের কপালে চুমু খেয়ে বিদায় দিলেন।

তাই দেখে হলের ছাত্রদের কী হাসাহাসি।

ওর বোনটাও ভাইটাকে চুমু দিল।

শওকতের মা কোনো দিন শওকতকে চুমু দেন নাই।

শওকতের বোনেরা কোনো দিনও শওকতকে চুমু দেয় নাই।

এই রকম আদরে-আহ্লাদে বড় হওয়া ছেলেদের জীবনে কী দুঃখ যে তারা গাঞ্জা হেরোইন খায়?

শওকত বলে, 'আলিমুদ্দি ভাই, লাশ কি পুলিশে নিয়ে গেছে?'

'জি না, স্যার। তপু স্যারের বাবা বড়লোক তো। পুলিশরে ম্যানেজ করছে। লাশ বাড়ি নিয়া গেছে। স্যার, তপু স্যারের মা ফিট হয়া গেছল।'

'তাই তো হওয়ার কথা, আলিমুদ্দি। মা তো। গরিবের মা-ও মা। বড়লোকের মা-ও মা। বড়লোকেরাও তাদের ছেলেমেয়ের মৃত্যু অ্যাফোর্ড করতে পারে না। একটা জীবনের অনেক দাম।'

কথাটা বলে শওকত চমকে ওঠে। বেশ বড় বড় কথা তো সে বলা শিখে ফেলেছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি মাকসুদার রাহমান যাচ্ছে শান্তিনগরের দিকে। ওখানে সাপ্তাহিক *যায়যায়দিন*-এর অফিস। *যায়যায়দিন* নামের একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়েছে। মাত্র ৩২ পৃষ্ঠা। দাম তিন টাকা। নিউজপ্রিন্ট দিয়েই প্রচ্ছদ।

ওই কাগজের বিরুদ্ধে মাকসুদারের রাগ। কারণ এর সম্পাদক বলেছেন, তিনি কবিতা ছাপাবেন না। তবে তিনিই আবার পাঠকসংখ্যা বের করেন। এবারের বিষয় ছিল : লজিং বাড়ি। মাকসুদারের একটা লেখা সেই সংখ্যায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। মাকসুদার তাই পত্রিকা অফিসে যাচ্ছে। এটাই তার জীবনে প্রথম কোনো কাগজের অফিসে যাওয়া।

শান্তিনগরও সে ঠিকমতো চেনে না। শুধু নামটার মধ্যে একটা শান্তি-শান্তি ব্যাপার লুকিয়ে আছে।

পত্রিকায় ছাপা ঠিকানা অনুযায়ী অফিসটা খুঁজে বের করতে অসুবিধাই হয়।

তবু শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় অফিসটা। সে অফিসে ঢুকে পড়ে। সামনে কতগুলো টেবিল। তাতে চার-পাঁচজন লোক বসে কাজ করছেন।

একজন গোঁফওয়ালা লোক, চোখে চশমা, জিগ্যেস করেন, 'কার কাছে এসেছেন।'

মাকসুদার বলে, 'আমার একটা লেখা আপনাদের প্রতিযোগিতায় সেকেন্ড হয়েছে।'

'কোন গল্পটা?'

'লজিংয়ের লজিক।'

'ভালো লিখেছেন। বসেন। আপনার নাম মাকসুদার রাহমান?'

'জি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাড়ি কই?'

'আমি বুয়েটে পড়ি। বাড়ি সিরাজগঞ্জ।'

'আচ্ছা। বুয়েটে পড়েন। বুয়েটের ছেলেরা তো দেখা যায় ভালো লেখে।'

'আচ্ছা তারিখ ইব্রাহিম কে?' মাকসুদার জিগ্যেস করে।

শুনে ভদ্রলোক হাসেন, 'আছে একজন।'

'আপনার নাম কী?'

'আমার নাম বিভুরঞ্জন সরকার।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনি শফিক ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবেন?'

'জি করব।'

'চলেন নিয়ে যাই।'

বিভুরঞ্জন সরকার নামের বছর চল্লিশের ভদ্রলোক তাকে সম্পাদকের রুমে নিয়ে যান। 'শফিক ভাই, বুয়েটের ছাত্র, ভালো লেখে। লজিংয়ের লজিক লেখাটা আপনি পছন্দ করেছিলেন। ইনি লিখেছেন।'

শফিক রেহমান মিষ্টি করে হাসলেন। 'আপনি নিজের নাম রাহমান করে নিয়েছেন। আমি যেমন করে নিয়েছি রেহমান। না হলে শফিকুর রহমান পৃথিবীতে ৫ লাখ ৭৭ জন আছে।'

'শুনুন। আপনি কি ইঞ্জিনিয়ার হতে চান? নাকি লেখক?'

'আমি কবি হতে চাই।'

'তাহলে আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন। আমরা কবিতা ছাপি না। শুধু শামসুর রাহমানের একটা ছেপেছি। কারণ, ওটা আমাদের প্রয়োজন মিটিয়েছিল।'

'আচ্ছা, আপনি কবি হতে চান। কবি হন আর লেখক হন, আপনাকে প্রচুর বই পড়তে হবে। আপনি যাযাবরের *দৃষ্টিপাত* পড়েছেন?'

'জি না।'

'তাহলে আপনি আজকে যান। যাযাবরের *দৃষ্টিপাত* না পড়লে আপনি লেখক হতে পারবেন না। শুনুন, আপনার প্রিয় লেখক কে?'

'জীবনানন্দ দাশ।'

'বাইরের লেখকদের লেখা পড়েছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পড়েছি।'

'যেমন?'

'আন্না কারেনিনা।'

'বাহ্। কোনটা?'

'ওই যে রাদুকা প্রকাশনীর বই। সেটা।'

'বাংলা অনুবাদ পড়েছেন। শুনুন, ইংরেজিতে পড়তে হবে। বাংলা বই পড়ে কেউ লেখক হতে পারবে না।'

'আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে?'

'জি না।'

'আপনি তো কিছুই হতে পারবেন না। আজকেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করবেন। আপনাকে কী বলব। আমার এখানে অর্থনীতি বিষয়ে যিনি কলাম লেখেন, তার নিজেরই অ্যাকাউন্ট নাই। এই জন্য বাঙালির কিছু হবে না। বুঝেছেন?'

'জি।'

'আপনার কি পাসপোর্ট আছে?'

'জি না।'

'আপনি কি কক্সবাজার গিয়েছেন?'

'জি না।'

'আপনার দ্বারা কিছুই হবে না। আপনি কক্সবাজার যাবেন। তারপর ফিরে আসবেন।'

'জি, আচ্ছা।'

AMARBOI.COM

মাকসুদার রাহমান মন খারাপ করে ফিরে আসে বুয়েটে। শুধু শুধু তার ২৫ টাকা খরচ হয়ে যায় রিকশাভাড়ার পেছনে।

কিন্তু সে ইংরেজিতে বই পড়া আরম্ভ করে। এবং ঠিক করে, সে অচিরেই কক্সবাজার যাবে।

'শুনেছিস, মৌটুসির তো বিয়ে।'

'মৌটুসির বিয়ে?'

'হ্যাঁ। ওদের একজন টিচারের সঙ্গে। নাম মাহবুব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আচ্ছা।'

ক্যানটিনে বসে মাকসুদার রাহমান ব্যাপারটাতে গা না লাগানোর ভাব দেখায়। কিন্তু তার চোখমুখ অন্ধকার হয়ে আসছে। তার কান ভোঁ ভোঁ করছে। সে ক্যানটিন থেকে উঠে নিজের রুমে চলে যায়।

পাবলো নেরুদার কবিতার বই বের করে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ।

এই রাত তারকাখচিত
আর সে আমার পাশে নাই...

আজ রাতে আমি লিখে ফেলতে পারি বিষণ্ণতম পঙ্‌ক্তিমালা
যেমন ধরো আমি লিখতে পারি
এই রাত তারকাখচিত
আর সে আমার পাশে নাই
সত্য বটে আজ আর তাকে ভালোবাসি না
কিন্তু এক সময় কী ভীষণ ভালোই না তাকে আমি বেসেছিলুম।

রাতের বেলা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, রাত তিনটার দিকে মাকসুদার রাহমান ঘুম থেকে জাগে। তিন রুমমেটের সবাই মশারির নিচে অচেতন। নাক ডাকারও শব্দ আসছে।

মাকসুদার রাহমানের ঘুম আসছে না। তাকে কবিতায় পেয়ে বসেছে। সে লিখে ফেলবে এখনই :

তুমি তো চলে যাবে আমি কি রয়ে যাব?
নৌকা চলে গেলে যেভাবে থাকে ঘাট?
শূন্য প্ল্যাটফর্ম যেভাবে চেয়ে দেখে
চলেছে রেলগাড়ি বিদায় প্রতিক্ষণ...

সারা রাত ধরে সে একটা কবিতা লেখে। ৪৩৫ লাইনের কবিতা। সকালে তার চোখ লাল। বিকালে তার কাছে এল শাহবাগের এক কবি। তার নাম শরিফ আল হাসান। শরিফ বলে, 'কী রে ভাই, আপনার চোখ লাল কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকসুদার তাকে কবিতাটা বের করে দেয়।

কবিতাটা পড়ে শরিফ তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আপনি তো এলিয়ট হয়ে গেছেন। টি এস এলিয়ট। চলেন, চলেন, সেলিব্রেট করতে হবে।'

সন্ধ্যার সময় শরিফ তাকে নিয়ে যায় নীলক্ষেতে। বাকুশাহ মার্কেটে। গলি-ঘুপচি পেরিয়ে একটা খালি দোকান। সেখানে কয়েকটা বেঞ্চ পাতা।

সেখানে তারা বসে একটা বেঞ্চে।

বলে, 'দাও দেখি দু গেলাস।'

ছোলা সেদ্ধ আসে। আর একটা কেরোসিনের বোতলের মতো বোতল। সঙ্গে সেভেন আপ। সেভেন আপ মিশিয়ে বোতলের অতি-অখাদ্য তরল দেওয়া হয় মাকসুদারের সামনে। শরিফ বলে, 'নিন, খান। এটা আপনার কবি হওয়ার সেলিব্রেশন।'

খুবই বাজে কটু গন্ধ আসছে। নাক চেপে ধরে মাকসুদার গেলাসে চুমুক দেয়।

শরিফ আঙুল উঁচিয়ে দেখায়, 'ওই দেখেন, আরেকজন বড় কবি বসে আছে ওখানে। বাংলা খাচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের চর্চা করতে হলে তো একটু বাংলা খেতে হবে, তাই না।'

সত্যি একজন প্রথিতযশা কবিকে দেখা যাচ্ছে ওখানে। তার পাশে আরও দুজন তরুণ কবি। শ্মশ্রুমণ্ডিত সেই তরুণ কবি হাত নেড়ে বলেন, 'শরিফ আল হাসান, তোমার পাশে ও কে?'

'এ-ও একজন কবি বড় ভাই,' শরিফ আল হাসান জবাব দেয়।

শুনে মাকসুদার রাহমানের ভারি ভালো লাগে। শরিফ আল হাসান তাকে কবি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আরেকজন কবির কাছে। আহা! জীবন সার্থক।

মৌটুসি, খুব ভালো করেছ, মাহবুব স্যারকে বিয়ে করে ফেলেছ। তাই তো আমি এত বড় কবিতা লিখে ফেলতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ, মৌটুসি। থ্যাংক ইউ—মাকসুদার বিড়বিড় করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকসুদার রাহমান বলে, 'সানার বাচ্চা, দ্যাখ, মোহন রায়হান ভালো কবিতা লিখে ফেলছে।'

সানা বলে, 'কই দেখি।'

মাকসুদার একটা কাগজে হাতের লেখায় কপি করা কবিতা এগিয়ে দেয়।

সানাউল্লাহ হাত বাড়িয়ে কাগজটা নেয়। তার হাতের সরষের তেল কাগজে লাগলে মাকসুদার বিরক্ত হয়, 'ওই কবিতাটায় তেল লাগায়া দিলি।'

'হ্যাঁ। কবিতাটাকে স্নিগ্ধ করলাম। তেল স্নেহজাতীয় পদার্থ। আর যাতে স্নেহ থাকে, তাকেই বলা হয় স্নিগ্ধ। স্নিগ্ধ মানে কিন্তু তেলতেলা। তবে আমার ধারণা, সেই তেল অবশ্যই সরিষার তেল।'

'কথা দোস্ত তুই ভালোই বলিস। এই জন্য তোর খ্যাতামি সত্ত্বেও তোকে আমার ভালোই লাগে।'

তারা বসে আছে তিতুমীর হলের ক্যানটিনে। চা খাচ্ছে, সঙ্গে বেগুনি।

সানা পড়ে :

মধুর ক্যান্টিনে যাই
অরুণের চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে
বসু, তোমাকে মনে পড়ে যায়।

তোমার সেই সদা হাসিমাখা ফুল্ল ঠোঁট,
উজ্জ্বল চোখের দ্যুতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারাক্ষণ চোখে চোখে ভাসে
বুঝি এখনই সংগ্রাম পরিষদের মিছিল শুরু করার
তাগিদ দিবে তুমি

ওই তো, ওই তো সবার আগে তুমি মিছিলে
কি সুঠাম তোমার এগিয়ে যাবার ভঙ্গিমা
প্রতিটি পা ফেলছ কি দৃঢ় প্রত্যয়ে
কি উচ্চকিত তোমার কণ্ঠের স্লোগান
যেন আকাশ ফেটে পড়বে নিনাদে
হাত উঠছে হাত নামছে
মাথা ঝুঁকছে ঘাড় দুলছে চুল উড়ছে বাতাসে
ওই তো, ওই তো আমাদের ঐক্যের পতাকা হাতে
এগিয়ে যাচ্ছ তুমি

মধুর ক্যান্টিনে যাই
নিত্যনতুন প্রোগ্রাম, মিছিল সভা বটতলা
অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে দুর্জয় শপথ
সামরিক জান্তার ছোবল থেকে
শিক্ষাজীবন, শিক্ষাঙ্গনের স্বায়ত্তশাসন রক্ষার অঙ্গীকারে
ডাক দেই দেশবাসীকে

তোমারি মত নিরাপত্তাহীনতায়
প্রতিটি ছাত্রের দুর্বিষহ জিম্মিজীবন এখনো এ ক্যাম্পাসে
হলে গেটে গেটে পড়ে থাকে ভয়ংকর
বিস্ফোরণোন্মুখ তাজা বোমা
প্রতিদিন চর দখলের মতো হল দখলের হিংস্র মহড়া
গুলি ও বোমা ফাটার শব্দ
এখনো আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অংশ
এ অস্ত্রের উৎস কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধুর ক্যান্টিনে যাই
প্রতিদিন আমাদের জীবন হাতের মুঠোয়
প্রতিদিন হামলা রুখতে হয়
বসু, আজ সেই প্রতিরোধের সারিতে তুমি নেই
আজ বড়ই অভাব অনুভব করছি তোমার

শিক্ষাভবন অভিমুখে সামরিক শাসন ভাঙার
প্রথম মিছিলে তুমি ছিলে
রক্তাক্ত ১৪ই ফেব্রুয়ারির কাফেলায় তুমি ছিলে
৪ঠা আগস্ট সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের কবল থেকে
আমাদের পবিত্র মাটি রক্ষা করার সম্মুখসমরে তুমি ছিলে
এমন কোন ধর্মঘট, হরতাল, ঘেরাও, মিছিল আন্দোলন নেই
যে তুমি ছিলে না

সেই নৃশংস ঘাতক রাতেও
তুমি অস্ত্রধারীদের দুর্গের দিকে অবিচল যাত্রা
অব্যাহত রেখেছিলে
ঘাতক বুলেট ভেদ করে গেছে তোমাকে
কিন্তু তুমি পিছু হটোনি
তুমি বীর, তুমি সাহসী যোদ্ধা, তুমি সময়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান
যুগে যুগে সংগ্রামীদের অফুরান প্রেরণা

মধুর ক্যান্টিনে যাই
অরুণের চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে
বসু, তোমাকে মনে পড়ে যায়।

কাউন্টারের সামনে কতদিন
তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেয়েছি
কতদিন তুমি আমাকে চায়ের পয়সা দিতে দাওনি
কতদিন চায়ের সঙ্গে একটি শিঙাড়া বা কেকের আবদার করেছ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতদিন তোমার সঙ্গে খোশগল্প হাসিঠাট্টায় মেতে উঠেছি
বসু, আজ সব কথা মনে পড়ে যায়।

রিপার বিয়েতে তুমি বলেছিলে
অ্যাকশনে আপনার আর আগে থাকার দরকার নেই,
আমরা তো আছি
বসু, তুমি রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে সে কথা প্রমাণ করে গেলে
বসু, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ ভালোবাসার একটি রক্তকরবী বৃক্ষ

মধুর ক্যান্টিনে যাই
বসু, তোমাকে মনে পড়ে যায়।

তোমার মৃত্যুর সেই নৃশংস ঘাতক রাত্রিতে
আমি ছিলাম ঢাকার বাইরে
তোমার গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত লাশ আমি দেখিনি
তোমার মৃত্যুর খবর শুনে
বারবার কান্নায় ভেঙে পড়েছিল মন
তবু সেই রাত্রেই আড়াই-শত মাইল দূর থেকে
সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা দিয়েছিলাম
তোমার হত্যার প্রতিশোধ নিতে
তোমার খুনিদের রক্তে হাত রাঙাতে

বসু, আমরা বহুবার তোমার হত্যার প্রতিশোধ নেবার
শপথ গ্রহণ করেছি
অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে, শহীদ মিনারে,
বটতলায়, বায়তুল মোকাররমে,
সারাদেশ তোমার হত্যার বদলা চায়
কিন্তু এখনো তোমার খুনিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়
এখনো তোমার ঘাতকেরা ক্ষমতার কালো কেদারায় বসে
রাইফেল তাক করে আছে আমাদের প্রতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসু, আমাদের শিক্ষানীতি এখনো বদলায়নি
সামরিক খাতে ব্যয় শিক্ষা খাতের চেয়ে আরও বেড়েছে
নতুন নতুন ক্যান্টনমেন্ট তৈরির পরিকল্পনা হলেও
সংস্কারের অভাবে জগন্নাথ হলের জীর্ণ ছাদ ধসে
তোমার অনেক বন্ধু মারা গেছে
এখনো হলে হলে মেধা-ভিত্তিক সিট বণ্টন চালু হয়নি

বসু, তুমি এসবের পরিবর্তন চেয়ে জীবন দিয়েছ
কিন্তু আমরা এখন তোমার একটি স্মৃতিসৌধ
নির্মাণ করতে পারিনি
বসু, আমরা তোমার কাঙ্ক্ষিত লড়াই চূড়ান্ত করতে পারিনি
আমরা তোমার হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারিনি
আমরা এখনো অজস্র বসু হতে পারিনি বলেই...

মধুর ক্যান্টিনে যাই
বসু, তোমাকে মনে পড়ে যায়
খুব মনে পড়ে।

AMARBOI.COM

পড়তে পড়তে সানার চোখ সজল হয়ে পড়ে। কবিতাটা পড়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে সানা বলে, 'মোহন রায়হান ভালো লিখছে!'

মাকসুদার বলে, 'রাউফুন বসুনিয়ার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে সেদিন আলাপ হলো। ফরচুন। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেই পড়ে। দেখতে একেবারে রাউফুন বসুনিয়ার মতোই।'

সানা বলে, 'নতুন বাংলা ছাত্রসমাজের গুন্ডাগুলান এখনো বহাল তবিয়তেই আছে। তাই না?'

মাকসুদার বলে, 'হ্যাঁ। আছে। তবে এফ রহমান হল থেকে এরশাদের নতুন বাংলা ছাত্রসমাজকে ১৪ ফেব্রুয়ারি রাউফুন বসুনিয়ার মৃত্যুর পরই বের করে দিয়েছে সবাই মিলে।'

সানা বলে, 'তার বাবা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। লালমনিরহাটের গ্রামের শিক্ষক। কারমাইকেল কলেজ থেকে আইএ পাস করেছে বসুনিয়া।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকসুদার বলে, 'বসুনিয়ারা কিন্তু বেশির ভাগই রংপুরের। জানিস, বসুনিয়া পদবি নাকি এসেছে বসনিয়া থেকে। এদের পূর্বপুরুষ নাকি বসনিয়া থেকে এসেছে।'

সানা বলে, 'না তো। শুনিনি কখনো। তবে শুনেছি, রাউফুন বসুনিয়ার গুলিবিদ্ধ লাশ গ্রামে গেলে সারা গ্রাম শোকে স্তব্ধ হয়ে যায়। তার বাবা-মা রোজ কবরে গিয়ে কাঁদে।'

'ভাইটাকে তো দেখলাম, সে-ও তো পলিটিক্যালি খুবই কমিটেড। লড়তে ভয় পায় না।'

'রাউফুন বসুনিয়া ১৪ ফেব্রুয়ারির দুই দিন আগেও লালমনিরহাটে গেছল। সেখানে ছাত্রসভায় ভাষণ দিয়েছে। বলেছে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগস্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।'

'তারপর তার মৃত্যু তাকে ঢাকায় ডেকে আনল?'

'গত বছর শিক্ষাভবন ঘেরাও কর্মসূচি ছিল না? এই ১৪ ফেব্রুয়ারিতে তার এক বছর। জাফর জয়নাল দীপালি সাহার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে বসুনিয়া ঢাকা চলে আসে। জাতীয় ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক তো!'

'আচ্ছা, বল তো মাকসুদার, তুই তো কবি হতে চাস। রাজনীতি নিয়ে তোর এত আগ্রহ কেন?'

'সরিষা সানা। আমার একটা দাঁত এরশাদের পুলিশ পিটিয়ে ভেঙে ফেলেছে। এই কথাটা মনে রাখবি,' মাকসুদার বলে।

'শুধু এই জন্য? যদি তোর দাঁত না ভাঙত, তুই রাজনীতি করতি না?'

'জানি না। আমি তৃতীয় বিশ্বের একজন কবি। এটা তো আমাদের নিয়তি যে আমরা রাজনীতির বাইরে থাকতে পারি না। শামসুর রাহমানের কবিতা আছে, স্বাধীন বিশ্বের কবিদের তিনি বলছেন তোমরা যারা ফুল নিয়ে পাখি নিয়ে জ্যোৎস্না নিয়ে কবিতা লেখো, তাদেরকে বড় ঈর্ষা করি।'

'হুঁ। যেদিন দেশে গণতন্ত্র আসবে, যেদিন কোনো রাষ্ট্র কোনো অন্যায় জুলুম করবে না, তখন আমরা মালার্মের মতো বিশুদ্ধ কবিতা লিখব।'

মাকসুদার বলে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লাইন থেকে, 'শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে, একটু পা চালিয়ে ভাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সানা বলে, 'আমাদের বুয়েটের মোজাম্মেল বাবুও কিন্তু রাউফুন বসুনিয়াকে নিয়ে দুটো দারুণ লাইন লিখেছেন—তোমার মৃত্যুতে পৃথিবীর তিন ভাগ জল অশ্রু হয়ে গেছে, রাজপথ হয়েছে আজ সাহসী মিছিল।'

মাকসুদার বলে, 'তোর এই কবিতার মধ্যেই তোর প্রশ্নটারও উত্তর আছে। পৃথিবীর সব রাজপথ মিছিল হয়ে গেলে আমি কী করে মিছিলের বাইরে থাকব?'

সানাউল্লাহ মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। বলে, 'মিছিলই আমাদের কবিতা। স্লোগানই আমাদের গান। মিছিলের পদক্ষেপই আমাদের ছন্দ।'

মাকসুদার বলে, 'সানারে, তুই সরিষা সানা হতে পারিস, কিন্তু কথা তুই খুব ভালো বলিস। একেবারে কবিদের মতো করে কথা বলতে পারিস তুই।'

সানা বলে, 'আমরাই তো একমাত্র কবি।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। কারণ, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যাচ্ছে। বিএনপি যাচ্ছে না। নানা রকমের বায়নাক্কা চলল কয়েক দিন। *যায়যায়দিন* থিয়োরি দিল, বলা হয়ে থাকে, এটা কমিউনিস্ট পার্টির মোহাম্মদ ফরহাদের তত্ত্ব, ১৫০-১৫০। ১৫০ সিটে শেখ হাসিনা দাঁড়াবেন, ১৫০ সিটে খালেদা। এরশাদ ৫টার বেশি সিটে একজনের দাঁড়ানোর পথ বন্ধ করে দিয়ে আইন করলেন।

শেষে শেখ হাসিনা বললেন, 'নির্বাচনে যাব।'

খালেদা জিয়া বললেন, 'যাব না।'

বুয়েটেও মারামারি লেগে গেল।

একদিকে ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন। অন্যদিকে জাসদ-বাসদ। সাথে তৃতীয় শক্তি ছাত্রদল।

ছাত্রদলের মিছিল আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে।

প্রথম দিকে ছাত্রদল করত কেবল ফেল করা ছাত্ররা। কিছুটা সুবিধার জন্য। কিন্তু এখন ছাত্রদলের মিছিলে সাধারণ ছাত্ররাও অংশ নেয়। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর থেকেই ছাত্রদের মধ্যে বিএনপির জনপ্রিয়তা বাড়ছে। নির্বাচনে না যাওয়ায় তাদের জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে গেল।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দুই গ্রুপে ঢিলাঢিলি-মারামারি। এই নিয়ে বুয়েটে উত্তেজনা। দুটো ককটেলও ফুটল।

হাবিব খুব ব্যস্ত মিছিল নিয়ে। জাসদের হয়ে সে মিছিল করে। প্রতিরোধে প্রতিশোধ। জাসদ জাসদ।

তবে বুয়েটের মারামারি তেমন কোনো মারামারি না। মিছিল শেষে জাসদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা আবার এক টেবিলে বসে খিচুড়ি খায়। দেখতে ভালোই লাগে।

নির্বাচন হয়ে গেল। আওয়ামী লীগ ভেবেছিল, তারা খুব ভালো করবে। এরশাদ সাহেব সেটা করতে দেবেন কেন? তিনি কোন আসনটা নেবেন, কোনটা ছাড়বেন, আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, নিজের মতো করে নির্বাচনের ফল বের করে নিলেন।

ক্লাস হয়। হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। আবার খোলে। শওকত মহা বিরক্ত। সে চায় তার ছাত্রজীবন তাড়াতাড়ি শেষ হোক। পাস-টাস করে বেরিয়ে সে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। তার আর ভালো লাগে না।

যায়যায়দিন নিয়মিত বেরোচ্ছে। মিলা আর মঈনের কাহিনি ক্যাম্পাসে খুব জনপ্রিয়। ওই পত্রিকায় প্রচ্ছদকাহিনি বেরোয়, ত্রিশ সেট অলংকার। সংসদে ত্রিশজন নারী সাংসদকে নিয়ে এটা লেখা হলে দেশে হইচই পড়ে যায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরশাদের সংসদ। প্রথম দিনের অধিবেশন বসছে। শেখ হাসিনা বিরোধী দলের নেত্রী। তারা সংসদে যোগ না দিয়ে নাটক করলেন। সংসদ ভবনের সিঁড়িতে তারা সংসদ অধিবেশন বসালেন।

ভেতরে সংসদ অধিবেশন চলছে।

বাইরে বাকশাল নেতা রাজ্জাক, আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিম প্রমুখের নেতৃত্বে মিছিল বেরোল সংসদ ভবন এলাকায়। পুলিশ নেতাদের মার দিল।

৫৪ ঘণ্টার হরতাল ডাকল বিরোধীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। বুয়েট খোলা। এই হরতাল সফল করার সব দায়িত্ব এসে পড়ল বুয়েটের নেতাদের ওপরে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতারাও এসে আহসানউল্লাহ হলের ক্যানটিনে ভিড় জমালেন।

হাবিব মিছিলে যেতে খুব পছন্দ করে। তার স্লোগান দিতে ভালো লাগে।

সে রাত দশটায় মিছিলে নেতৃত্ব দেয়।

হরতাল হরতাল
রেলের চাকা ঘুরবে না
দোকানপাট খুলবে না

সেই মিছিল পলাশী থেকে বেরিয়ে আজিমপুর ঘুরে আবার ক্যাম্পাসে ফিরে আসে। হাজার হাজার ছাত্র সেই মিছিলে অংশ নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরতাল শুরু হয়। বড় বড় পানির ট্যাংকি এনে পলাশীর মোড় বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ছেলেরা মিছিল নিয়ে আজিমপুরের দিকে যায়। সেখানে সেনা রিক্রুটিং সেন্টার আছে। চার-পাঁচজন কর্মচারী সেখানে কাজ করে। ছেলেরা সেটায় ঢুকে কর্মচারীদের মেরেধরে বের করে দেয়। তারপর পোশাক বের করে নিয়ে আসে পলাশীর মোড়ে। টেলিফোনের তারে সেই পোশাক দেয় ঝুলিয়ে।

পরের দিন আবার মিছিল বের হয়।

পলাশী থেকে আজিমপুরের দিকে মিছিল যেই না পা বাড়িয়েছে, অমনি গুলি।

হাবিবের পাশেই তিনজন ঢলে পড়ে। রাস্তায়।

ছত্রভঙ্গ মিছিল বুয়েটে ফিরে আসে।

তখন ক্যাম্পাসের ভেতরে মিছিল শুরু হয়: বুয়েট ছাত্র মরল কেন, খুনি এরশাদ জবাব চাই।

বুয়েটের সব ছেলেমেয়ে সেই মিছিলে যোগ দেয়।

মিছিল করে ছেলেরা তোপখানা রোডে প্রেসক্লাবে যায়। ভেতরে ঢুকে সাংবাদিকদের জানায় ঘটনা। তারপর আবার ফিরে আসে ক্যাম্পাসে।

এরই মধ্যে জানা যায়, যারা পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন, তারা কেউই বুয়েটের নন।

পুরো ক্যাম্পাস শান্ত হয়ে ভাতঘুমে ঢলে পড়ে।

পরের দিন সকালবেলা আবার মিছিল।

বাংলার বাণী লিখেছে: গুলিতে ৩ বুয়েট ছাত্র নিহত।

জঙ্গি মিছিল ছুটছে প্রেসক্লাব অভিমুখে—বুয়েট ছাত্র মরল কেন/ খুনি এরশাদ জবাব চাই।

মিছিলের নেতারা প্রেসক্লাবের ভেতরে গিয়ে *বাংলার বাণীর* সাংবাদিককে পেয়ে যান। তারা জিগ্যেস করেন, 'বুয়েটের ছাত্র নিহত হয়েছে, এটা আপনারা জানলেন কী করে?'

'আপনাদের কাছ থেকে। আপনারাই তো গতকাল প্রেসক্লাবে এসে বলে গেছেন, বুয়েটের ছাত্র মারা গেছে।'

নেতারা মুখ কাঁচুমাচু করে ফের ক্যাম্পাসে ফিরে আসে। মিছিলও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

তারপর দুপুরের ভাত খায় ছাত্ররা। ডাইনিংয়ে, ক্যানটিনে।

তারপর তারা ঘুমোতে যায়। দিবানিদ্রা। ভাতঘুম।

বিকেল হলে ছেলেরা বেরিয়ে পড়ে হরতাল দেখতে।

পুরো ঢাকা অচল।

এখানে-ওখানে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে রাজপথে।

মানুষ হরতাল দেখতে বেরোয়।

পরের দিন দৈনিক *ইত্তেফাক*-এ ছবির নিচে পরিচিতি লেখা হয় : ৫৪ ঘণ্টার হরতালের দ্বিতীয় দিনে গতকাল হরতালদর্শী জনগণ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ে।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের খবরে বলা হয়, দেশের কোথাও কোনো রকমের হরতাল হয় নাই।

হরতালের খবর শোনার জন্য লোকে ভিড় করে বিবিসি রেডিও শোনে। রাত পৌনে আটটায় বাংলা খবর হয়। তার শুরুতেই বলা হয়, বাংলাদেশে ৫৪ ঘণ্টার হরতালের দ্বিতীয় দিনে জনজীবন অচল হয়ে পড়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকসুদার অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে শামসুর রাহমানের দিকে। তাঁর শুভ্র চুল, কাশফুলের মতো, কিছু কাঁচা, বেশির ভাগটাই পাকা। তাঁর বড় বড় চোখ। তাঁর মুখমণ্ডল দিয়ে যেন ফুটে বেরোচ্ছে জ্যোতি।

তিনি পরেছেন সাদা শার্ট, তার ওপরে বাদামি রঙের সোয়েটার। তাঁর চশমার ফ্রেম ভারী আর কালো, চশমার কাচ দেখেও বোঝা যাচ্ছে, পাওয়ার বেশি।

আজ তিনি এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির দোতলায়। এখানে জাতীয় কবিতা উৎসবের অফিস খোলা হয়েছে।

লোকজন আসছে, যাচ্ছে। আসছেন কবিরা।

নির্মলেন্দু গুণও একদিন এসেছিলেন টিএসসিতে। বড় বড় দাড়ি, তোবড়ানো গাল, গনগনে চোখ। চেহারা খানিকটা রবীন্দ্রনাথের মতোই দেখায়। নির্মলেন্দু গুণকে দেখে মাকসুদারের বড় ভালো লাগে। তার প্রিয় কবি মানুষটা এত কাছে। যদিও এর আগে কবি নির্মলেন্দু গুণের বাসায় একবার সে গিয়েছিল। তাদের হলে সাংস্কৃতিক সপ্তাহ হয়। সন্ধ্যার সময় আয়োজন করা হয় আবৃত্তি-বিতর্ক-সংগীতের প্রতিযোগিতার। তাতে বিচারক হন রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ড. ইনামুল হক স্যার, যিনি টেলিভিশনে নাটক লিখে ও অভিনয় করে বিশেষভাবে বিখ্যাত। তার সঙ্গে অনেক সময় পাওয়া যায় তাঁর স্ত্রী লাকি ইনামকে। ইনামুল হক স্যারকে ধরলে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় থেকে পাওয়া যায় অভিনেতা খালেদ খান, কিংবা নিমা রহমানকে। এরা আসেন বিচারক হয়ে। হলে তখন চাঞ্চল্য পড়ে যায়। নিমাকে এক নজর দেখার জন্য ছেলেরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঘুরঘুর করতে থাকে। তখনই আয়োজকেরা লাকি কুপন বিলি করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুষ্ঠানের শেষে লটারি হবে। তাৎক্ষণিক আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হবে সেই লটারি বিজয়ীদের। ডাইনিং হলে খাওয়া-দাওয়া শেষে টেলিভিশন দেখতে কমন রুমে আসা ছেলেরা লটারির পুরস্কারের লোভে অনেক সময় এই সব আবৃত্তি বা বক্তৃতার অনুষ্ঠানে শেষ পর্যন্ত রয়ে যায়। তাদের অনেকেরই পরনে থাকে লুঙ্গি।

সরিষা সানা আর কবি মাকসুদার (হলের ছেলেরা তাকে কবি বলে ডাকে) একদিন চলে যায় নির্মলেন্দু গুণের বাসায়।

নির্মলেন্দু গুণ পলাশীতেই থাকেন। বুয়েটেরই চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের কোয়ার্টারে। মানে তাদের তিতুমীর হল থেকে জোরে ঢিল মারলে নির্মলেন্দু গুণের বাসার টিনের চালে গিয়ে পড়বে।

কবিকে তারা নিমন্ত্রণ করতে চায় তাদের হলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। অতিথি হয়ে আসতে পারেন, বিচারক হিসেবে আসতে পারেন। আসল কথা হলো, কবির সান্নিধ্য পাওয়া। ওরে বাপরে। কত বড় কবি তিনি। তাঁর 'হুলিয়া' কবিতা অবলম্বনে সিনেমা বানানো হয়েছে, তানভীর মোকাম্মেল নামের একজন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলন কর্মী বানিয়েছেন। ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলনে তাদের হলের সামনে শামিয়ানা টানিয়ে সেই ছবি দেখানো হয়েছে। শেখ মুজিবকে যখন দেখানো হয়, তখন কী যে তালি পড়ে।

AMARBOI.COM

সরিষা সানা আর মাকসুদার কবির বাসা খুঁজতে বের হয়। তারা ঠিক দুপুরবেলা বের হয় কবির বাড়ির উদ্দেশে। ১০ মিনিট হাঁটলেই এসে পড়ে পলাশী ব্যারাকে। চায়ের দোকানে গিয়ে তারা জিগ্যেস করে, 'কবি নির্মলেন্দু গুণের বাড়ি কোনটা?'

দোকানি বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকেন। কথাটার মানে তিনি বুঝতে পারছেন না।

'কবি নির্মলেন্দু গুণের বাড়ি কোনটা?'

তখন মাকসুদার একটু ভেঙে বলে, 'এই যে একটা লম্বা লোক, মুখে বড় বড় দাড়ি, মোচ, রবীন্দ্রনাথের মতো দেখতে, কবি...কবি নির্মলেন্দু গুণ...'

এইবার দোকানি বুঝতে পারেন। বলেন, 'ওই যে টানা হলুদ টিনে ছাওয়া ঘরটা, ওইটাতে থাকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা সেই হলুদ দেয়াল টিনে ছাওয়া লম্বা ঘরটার দিকে এগিয়ে যায়।

বোঝা যাচ্ছে, একেকটা ঘরে একেকটা পরিবার বাস করে।

তাদের একটা কমন বাথরুম। সেই বাথরুমের সামনে নারী-পুরুষ-শিশুর ভিড়।

থালাবাসন মাজছেন, এমন একজন মহিলাকে তারা জিগ্যেস করে, 'নির্মলেন্দু গুণের ঘর কোনটা?'

তিনি দেখিয়ে দেন কোনার দিকের একটা রুম।

তারা সেই রুমের বারান্দায় ওঠে। মাকসুদার আবৃত্তি করতে থাকে 'হুলিয়া' কবিতা থেকে—'আমি যখন গ্রামে পৌছলুম তখন দুপুর, আমার চতুর্দিক চিকচিক করছে রোদ শোঁ শোঁ করছে হাওয়া। আমার শরীরের ছায়া ঘুরতে ঘুরতে ছায়াহীন একটি রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে।'

সে নিজের ছায়ার দিকে তাকায়। ছায়াটা ঘুরতে ঘুরতে ছায়াহীন কায়া হয়ে গেছে কি না!

নির্মলেন্দু গুণ বাড়িতেই ছিলেন।

তারা দরজার কড়া ধরে নাড়ে।

ভেতর থেকে আওয়াজ আসে, 'কে?'

মাকসুদার বলে, 'আমরা বুয়েট থেকে এসেছি। কবি নির্মলেন্দু গুণ কি আছেন?'

তখন দরজা খুলে যায়।

একটা লাল রঙের লেপ, ওয়্যার ছাড়া, গায়ে-মাথায় চাপিয়ে কবি নির্মলেন্দু গুণ দরজা খোলেন।

'বুয়েট থাইকা আইছ? আমার কাছে? ক্যান আইছ?'

তিনি তাঁর বিছানায় গিয়ে আবার শুয়ে পড়েন। বলেন, 'বড় ঠান্ডা।'

'আসো। তুমি ওই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসো। আর তুমি বিছানায় বসো। শোনো, তোমাকে বিছানায় বসতে বললাম বলে ভেবো না অসম্মানিত করছি, কবির বিছানায় বসতে পারায় গৌরব বেশি।'

মাকসুদার বসে বিছানায়। আর সরিষা সানা চেয়ারে। ঘরে কোনো লেখার টেবিল নাই। একটা টেলিভিশন আছে। মাকসুদার জানে, এটা প্রকাশক ফরিদ আহমেদ তাঁকে দিয়েছেন বই লেখার রয়ালটি হিসেবে।

এই টেলিভিশন আর বিশ্বকাপের খেলা নিয়ে তাঁর কবিতা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ গোল নেই, পেনাল্টি নেই, কর্নার নেই, অফসাইড নেই,
কোনো টাফ-ট্যাকলিং নেই; আজ সারা পৃথিবীর ছুটি।
হাভাল্যাঞ্জ এখন ঘুমাচ্ছেন। ম্যারাডোনা, রুমানিগে,
প্লাটিনি, সক্রেটিস আজ আকাশে উধাও।
টিভির পর্দাকে আজ মনে হল মৃত ইলিশের চোখের মতন স্থির,
চঞ্চলতাহীন, স্বচ্ছ-শূন্য কাচ। আজ এই মধ্যরাতে
টিভির পর্দায় হঠাৎ আবিষ্কৃত হলো আমার হৃদয়।

ঘরের ভেতরেই হাঁড়িকুঁড়ি, থালাবাসনও দেখা যাচ্ছে এক পাশে।

আর বিছানার অর্ধেকটা জুড়ে বই।

মাথার কাছে বই। মাটিতে বই। একটা বেতের বুকশেল্ফ জুড়ে বই আর বই।

সরিষা সানা বলে, 'দাদা, আপনার বুকে তো মনে হয় ঠান্ডা বসে গেছে। আপনি গরম সরিষার তেল বুকে মালিশ করেন।'

মাকসুদার হাসি গোপন করতে পারছে না।

নির্মলেন্দু গুণ বলেন, 'তেল তো পাওয়া যাবে, মালিশ করার লোক নাই। কেন এসেছ, বলো!'

মাকসুদার বলে, 'দাদা, আমরা তিতুমীর হলে থাকি। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি সপ্তাহ হচ্ছে। আপনাকে একদিন আসতে হবে আমাদের প্রধান অতিথি হয়ে।'

নির্মলেন্দু গুণ বলেন, 'এই ঠান্ডার মধ্যে আমি বের হতে পারব না, বুঝলা। আমি কত দিন স্নান করি না, জানো?'

সানা বলে, 'কত দিন?'

নির্মলেন্দু গুণ বলেন, 'আইজকা ২৬-২৭ দিন হবে। ঠান্ডার ভয়ে স্নান করি না। আরে মিয়া, ঠান্ডার ভয়ে কবিতাও লিখি না। লেপের নিচে হাত রেখে লেখা যায় না।'

মাকসুদার বলে, 'দাদা, তাহলে বসন্তের সময় আপনাকে নিয়ে যাব একবার। একটা কবিতা পাঠের আসর করব। আপনি আসবেন।'

কবি বলেন, 'বসন্তের কবিতার আসর কি এখন সংগত হবে? দেশের মানুষ লড়াই-সংগ্রাম করছে। আচ্ছা, আগে তো বসন্ত আসুক। রবীন্দ্রনাথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেহেতু বলেছেন, "তোমার বসন্তদিনে আমার বসন্তগান ধ্বনিত হোক ক্ষণতরে।" কাজেই কিছুক্ষণতরে একটা আসর বসতে পারে। আগে বসন্ত আসুক, কোকিল ডাকুক, তারপর আমাকে ডেকো। আমি বসন্তের কোকিল, শীতে আমার দেখা পাবে না।'

সেই শীতকাতর কবি নির্মলেন্দু গুণও একদিন এসে হাজির হয়েছিলেন টিএসসির দোতলায়। চাদর জড়িয়ে। তবে তিনি যখন হাঁটেন, মাথা উঁচু করে হাঁটেন।

মাকসুদার তাঁকে দেখে এক কাপ গরম চা হাতে করে এগিয়ে গিয়েছিল, 'দাদা, চা খান। শীতকালের মহৌষধি। দাদা, মনে আছে, আমি আপনার বাসায় গিয়েছিলাম। বুয়েটের তিতুমীর হল থেকে। আপনি কিন্তু বুয়েটে বসন্তকালের কবিতা উৎসবে আসতে রাজি হয়েছেন।'

কবি বেশ আগ্রহ-সহকারে তাকিয়ে ছিলেন, 'তুমি আমার বাসা গেছলা? হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হয় গেছলা। তোমার নামটা যেন কী?'

'মাকসুদার রাহমান।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়ছে। আজকাল নাম মনে রাখতে পারি না, বুঝলা। বড় কবিদের এই রকম হয়, তারা ভুলে যায়। আমার মনে হয় শিগগিরই আমি বড় কবি হয়ে যাচ্ছি।'

'দাদা, আপনি তো বড় কবিই। আপনার তো কবিতার লাইন আছে, নাম ভুলে গেছি দুর্বল মেধা স্মরণে রেখেছি মুখ,/ কাল রজনীতে চিনিব তোমায় আপাতত স্মৃতিভুক।'

'হ্যাঁ। আছে। তুমি তো দেখছি আমার কবিতার লাইন মুখস্থ রেখেছ।'

'আপনার অনেক কবিতাই আমার মুখস্থ আছে, দাদা।'

সেদিন নির্মলেন্দু গুণের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছিল মাকসুদার। আজকে শামসুর রাহমানের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খুঁজছে সে। কিন্তু শামসুর রাহমান এত বড় কবি, আর তাঁর চেহারার মধ্যে এমন একটা দেবদূতোপম সৌন্দর্য আছে যে মাকসুদার কাছে যাওয়ারই সাহস পাচ্ছে না।

শামসুর রাহমান কথা বলেন মৃদু স্বরে, কেউ কিছু বললে এমনভাবে তাকান যে মনে হয় এ ধরনের কথা তিনি এর আগে কোনো দিনও শোনেননি। তাঁকে শিশুর মতো সরল বলে মনে হয়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকসুদারের জীবনের পরমতম সুযোগটি এসে যায়। শামসুর রাহমান বাড়ি যাবেন, একটা মাইক্রোবাস তাঁকে দিয়ে আসবে তল্লাবাগ, তাঁকে তো একা ছাড়া যাবে না; কারণ, তাঁর নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে, কে কে যাবে সঙ্গে, আরও দুজন তরুণ কবির সঙ্গে সেই সুযোগ চলে আসে মাকসুদারেরও!

সামনে বসেন তরুণ কবি শ্যামল।

মাঝখানে কবি শামসুর রাহমান।

পেছনের আসনে বসেন অরুণদা।

শামসুর রাহমানের পাশে বসার বিরলতম সুযোগটি পায় মাকসুদার।

সে কুঁকড়ে থাকে। একটা কথাও আর তার মুখ থেকে বেরোচ্ছে না।

শামসুর রাহমানের কত কবিতা তার মুখস্থ!

সে কবিকে কবির লেখার কবিতা শোনাতে পারে।

সে তাকে জিগ্যেস করতে পারে, আপনি কখন লেখেন। সকালে, না রাতে?

সে তাকে জিগ্যেস করতে পারে, আপনার মা কেমন আছেন? তিনি কি 'কখনো আমার মাকে' কবিতাটার কথা জানেন। এটা শোনার পরও কি তিনি কখনো এক লাইন গানও গুনগুন করে গাননি!

কিন্তু সে তাকে কী বলে সম্বোধন করবে?

সবাই কবিকে ডাকে রাহমান ভাই বলে।

মাকসুদারের নামের শেষেও তো রাহমান। সেই কথাটা কি সে তাকে বলবে? তিনি যদি মন খারাপ করেন। যদি বলেন, আমার নামের ইউনিকনেস তুমি কেন নষ্ট করবে?

কবি বেলাল চৌধুরী কবিকে ডাকেন 'স্যার' বলে।

তাহলে কি মাকসুদারও কবিকে স্যার বলে ডাকবে!

কবি নিজেই মুখ খোলেন। বলেন, 'আপনাদের কষ্ট করে আমার সঙ্গে যাবার দরকার ছিল না। অযথা কষ্ট করলেন।'

মাকসুদার জানে, কবি শামসুর রাহমান কাউকেই 'তুমি' বলে সম্বোধন করেন না। সবাইকে তিনি ডাকেন 'আপনি' করে।

সে বলে, 'আমাদের তো কষ্ট নয়, এটা আমাদের সৌভাগ্য যে আপনার সঙ্গে একই গাড়িতে আমরা উঠেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি বলেন, 'আমি কিন্তু আগে রাজনীতিবিমুখ ছিলাম। আমার বন্ধু হাসান হাফিজুর রহমান খুব রাজনীতি-সচেতন ছিলেন, রাজনীতি-সংলগ্ন ছিলেন। কিন্তু এখন আমি বুঝি, দেশের প্রয়োজনে কবিদেরও রাজনীতি-সচেতন হতে হয়। চুপচাপ বসেও থাকা যায় না। সক্রিয় হতে হয়। আমরা একাত্তর সালে মিছিল করেছিলাম। সেসব দিনের কথা মনে হচ্ছে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আমাদের একইভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।'

মাকসুদার কবির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাইক্রোবাসে পাশাপাশি আসনে বসে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা বেশ কষ্টেরই। মাকসুদারের ঘাড়ে ব্যথা হয়ে যায়।

শামসুর রাহমানকে কবিতা উৎসবে পাওয়া একটা ঘটনা।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ একটা এশীয় কবিতা উৎসব করছেন। সৈয়দ আলী আহসান, ফজল শাহাবুদ্দীন, আল মাহমুদ প্রমুখ কবি আছেন ওই কবিতা উৎসবের সঙ্গে। এই উৎসব বসবে পাঁচতারা হোটেলে।

তারই পাল্টা এই আয়োজন। যদিও জাতীয় কবিতা উৎসবের কবিরা তা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, 'আমরা কারও পাল্টাপাল্টি উৎসব করছি না। আমরা চলছি আমাদের নিজেদের মতো, আমাদের নিজেদের মতে। কবিতা একটা বিশুদ্ধ ব্যাপার, স্বৈরাচারী দুঃশাসনের সঙ্গে কবিতা চলতে পারে না।'

শৃঙ্খলমুক্তির জন্য কবিতা—এই হলো জাতীয় কবিতা উৎসবের স্লোগান।

টিএসসির সড়কদ্বীপের কাছে বড় মঞ্চ বানানো হচ্ছে।

রাজপথ জুড়ে থাকছে প্যান্ডেল।

ফয়েজ আহমদ কবিতা উৎসবের আহ্বায়ক। সভাপতিত্ব করবেন শামসুর রাহমান।

টিএসসির কার্যালয় বিকাল থেকে রাত নয়টা-দশটা অবধি গমগম করে। কবি মহাদেব সাহা আসেন, আসেন রফিক আজাদ, হুমায়ুন আজাদ। হেলাল হাফিজকেও দেখা যায় মাঝেমধ্যে।

আর আসেন রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ।

তিনি গান লিখেছেন কবিতা উৎসবের জন্য। সেটায় সুর দেওয়া হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পী ইউসুফ হাসান পোস্টারের নকশা করছেন কবিতা উৎসব উপলক্ষে। মোজাম্মেল বাবু আর তারিক সুজাত ব্যস্ত কবিতা উৎসবের বুলেটিন বের করার কাজে।

মাকসুদার কবিতা উৎসবের বুলেটিনের জন্য লেখা তৈরি করছে। সেসব সে দেখিয়ে নিচ্ছে হুমায়ুন আজাদের কাছ থেকে।

আল আমিন ব্যস্ত কবিদের নাম নথিভুক্ত করার কাজে। সারা দেশ থেকে কবিরা আসছেন কবিতা নিয়ে। সে এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার।

এই দক্ষযজ্ঞের ভেতরে মাকসুদার পেয়ে যায় শামসুর রাহমানকে।

তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে মনে মনে আবৃত্তি করে :

জেনেছি কাকে চাই, কে এলে চোখে ফোটে
নিমেষে শরতের খুশির জ্যোতিকণা;
কাঁপি না ভয়ে আর দ্বিধার নেই দোলা—
এবার তবে রাতে হাজার দীপ জ্বেলে
সাজাব তার পথ, যদি সে হেঁটে আসে।
যদি সে হেঁটে আসে, প্রাণের ছায়াপথ
ফুলের মতো ফুটে তারার মতো ফুটে
জ্বলবে সারারাত, ঝরবে সারারাত।
জেনেছি কাকে চাই, বলি না তার নাম
ভিড়ের ত্রিসীমায়; স্বপ্ন-ধ্বনি শুধু
হৃদয়ে বলে নাম, একটি মৃদু নাম।

মাইক্রোবাস শাহবাগ থেকে সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড় হয়ে মিরপুর রোডে ওঠে। তারপর এগোতে থাকে তল্লাবাগের দিকে।

সোবহানবাগ মসজিদের উল্টো দিকে তল্লাবাগ। সেখানে কবির বাসা।

বাসার সামনে গিয়ে গাড়ি থামলে শ্যামল তাড়াতাড়ি নামলেন। দরজা খুলে দিলেন। বললেন, রাহমান ভাই, দেখে নামেন। জায়গাটা একটু উঁচু-নিচু।

শামসুর রাহমান নামলেন।

তারপর নামল মাকসুদার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি বলেন, 'আপনারা আসুন। চা খেয়ে যান।'

শ্যামল বলেন, 'আরেক দিন আসব, রাহমান ভাই। অনেক কাজ বাকি। আমাদের দৌড়ে আবার টিএসসি যেতে হবে।'

শামসুর রাহমান বলেন, 'আচ্ছা, তাহলে আরেক দিন অবশ্যই আসবেন।' তিনি নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়ানোর আগে হাত মেলান শ্যামল আর মাকসুদারের সঙ্গে।

মাকসুদারের হাতে কবি শামসুর রাহমানের হাত। কী মোলায়েম আর কী উষ্ণ।

মাকসুদার কবির হাত ধরে কাঁপছে। এই হাতে শামসুর রাহমান লিখেছেন কী সব অমর পঙ্‌ক্তিমালা! 'স্বাধীনতা তুমি', কিংবা 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা'। এগুলোও মুখ্য নয়, তিনি তাঁর প্রথম কবিতার বই *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*র প্রথম কবিতাটাই বা লিখতে পারলেন কোন জাদুবলে! ল্যাজারাস তিন দিন কবরে থেকে ফিরে এসেছে পৃথিবীতে, তাকিয়ে দেখছে পৃথিবীটাকে—

এই সেই পৃথিবী অপার, মাটি যার এতকাল
সুপুষ্ট স্তনের মতো ফল আর ফাল্গুনের ফুল
করেছে উৎসর্গ নিত্য সন্তানের শ্রম প্রজ্ঞা প্রেমে
পূর্ণ হয়ে দীর্ণ হয়ে? এই সেই পৃথিবী সাবেকি?

একজন তরুণ কবির প্রথম কবিতার বইয়ের প্রথম কবিতা এত পরিপক্ব হতে পারে! চিন্তাটাই কী অভিনব! বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কবিতা তো এত পরিণত ছিল না, এমনকি জীবনানন্দ দাশের প্রথম দিকের কবিতায় মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব স্পষ্ট।

মাকসুদার হাত ছেড়ে দিয়ে শামসুর রাহমানের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ।

অরুণও সামনে চলে আসেন। এবার তারা তিনজন গাড়িতে। প্রধান কবিকে নামিয়ে দিয়ে তারা ফিরে আসছে মাইক্রোবাসে।

মাকসুদারের মনে হচ্ছে, মাইক্রোবাস-জুড়েই একটা সুরভি ছড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। ছড়িয়ে আছে কবিতার বইয়ের সোঁদা গন্ধ।

১ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন হয় কবিতা উৎসবের। উদ্বোধন ঘোষণা করেন সুফিয়া কামাল।

পতাকা উত্তোলনের সময় মাকসুদার গিয়ে দাঁড়ায় সুফিয়া কামালের পাশে। তাঁর পতাকার দড়ি বেঁধে দিল সে পতাকাদণ্ডে।

অনেকগুলো ক্যামেরায় সেই ছবি ধরা থাকল। মাকসুদারের মনে হয়, সে ইতিহাসের মধ্যে নিজের ছবি পুরে দিতে পারল।

প্রথম সন্ধ্যায় কবিতা উৎসবে যোগ দেয় হাজার হাজার মানুষ।

দ্বিতীয় সন্ধ্যায় কবিতা পড়বেন ঢাকার কবিরা।

মাকসুদার তাঁদের সঙ্গে কবিতা পড়ার সুযোগ পাবে না বটে, তবে তাঁদের আগে আগেই পড়ে ফেলবে।

সে একটা কবিতা জমা দিয়েছিল। সেটা মনোনীত হয়েছে।

সুরঞ্জনা বাংলা কবিতা, ওইখানে যেও নাকো তুমি
বলো নাকো কথা ওই বৃদ্ধের সাথে
বলো নাকো কথা ওই উর্দি ও বন্দুকের সাথে...

মাকসুদার এই কবিতাটা পড়ছে। 'সুরঞ্জনা, ওইখানে যেও নাকো' শুনে অনেকেই হয়তো ভেবেছিল জীবনানন্দ দাশের কবিতা নিজের বলে চালাচ্ছে নাকি, কিন্তু পরের লাইন শোনামাত্রই শ্রোতারা হাততালি দিয়ে ওঠে।

মাকসুদারের গলা সামান্য কাঁপছিল বটে, কিন্তু সে নিজেকে ভালোই সামলে নিতে পেরেছে।

তবে সবচেয়ে বেশি করতালি পান লুৎফর রহমান রিটন। তিনি পড়েন :

আবদুল হাই
করে খাই খাই
এক্ষুনি খেয়ে বলে কিছু খাই নাই...

রাত ১১টা পর্যন্ত চলে কবিতা পড়া। মানুষ ভিড় করে কবিতা শুনছে। হাততালি দিচ্ছে। মেলা বসে গেছে জায়গাটায়। লোকে লোকারণ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেরিওয়ালারা কেরোসিনের প্রদীপ জ্বেলে কবিতা শুনছে আর বাদাম, ঝালমুড়ি ইত্যাদি বিক্রি করছে। এমনকি প্রহরারত পুলিশও এরশাদ-বিরোধী কবিতা শুনে হেসে ফেলছে ফিক করে।

অনেক রাতে মাকসুদার ফিরে আসে হলে।

প্রচণ্ড শীত পড়েছে। হলের বেশির ভাগ রুমের বাতিই বন্ধ হয়ে গেছে।

রাতের খাওয়া খেতে হলে যেতে হবে আহসানউল্লাহ হলের ক্যানটিনে। এত রাতে হয়তো কেবল ওই ক্যানটিনই খোলা আছে।

মাকসুদার আহসানউল্লাহ হলের ক্যানটিনের দিকে এগিয়ে যায়। কুয়াশার মধ্যে ল্যাম্পপোস্টের বাতিগুলো সাধ্যমতো আলো দিচ্ছে। ডাস্টবিনের ময়লা নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে রাস্তার কুকুরগুলো।

তিতুমীর হল থেকে আহসানউল্লাহর ক্যানটিন ৫ মিনিটের পথ।

ক্যানটিন খোলা। বড় তাওয়ায় পরাটা ভাজা চলছে।

পরাটা ডাল-ডিমের অর্ডার দিয়ে হাত ধুতে যায় মাকসুদার। ডান হাতের দিকে তাকায়। এই হাতে সে কবি শামসুর রাহমানের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেছে। এই হাতে সে ধরেছে সুফিয়া কামালের ধরা পতাকার দড়ি। তার হাত ধন্য হয়ে গেছে। দরকার নাই হাত ধোওয়ার। শামসুর রাহমানের হাতের স্পর্শ, সুফিয়া কামালের পরোক্ষ ছোঁয়া থাকুক না তার হাতে, আরও খানিকটা সময়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকতের পায়ে ব্যথা করছে। স্বৈরাচারী এরশাদের পুলিশের মারে তার পা ভেঙেছিল। প্লাস্টার করে পড়ে থেকে পা ভালোও হলো, কিন্তু পুরোপুরি হয়নি। এত দিন পর আবার ব্যথা করছে।

এ জন্য অবশ্য তার টেনিস খেলা দায়ী হতে পারে।

থার্ড ইয়ারের ফাইনাল পরীক্ষায় থার্ড হয়েছে সে।

সিভিলে পাঁচ-ছয়জন শিক্ষক প্রতিবছর নেওয়া হয়। সেই হিসেবে শওকতও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে পারে। তাহলে তাকে শিক্ষকদের কোয়ার্টারে থাকতে হবে, শিক্ষকদের ক্লাবে যেতে হবে এবং টেনিস খেলতে হবে।

তাই সে চলে যায় নিউ মার্কেটে। স্পোর্টসের দোকান খোঁজে। একটা টেনিস ব্যাট তাকে কিনতে হবে।

তার সঙ্গে যান শাহিন ভাই। শাহিন ভাই এক বছর ফেল করে এখন ফোর্থ ইয়ারে।

শাহিন ভাই বলেন, 'তুমি যে টেনিস ব্যাট কিনতে চাও, তুমি টেনিস খেলা বোঝো?'

শওকত বলে, 'জি শাহিন ভাই, বুঝি তো।'

শাহিন ভাই বলেন, 'কী বলো। তুমি টেনিস বোঝো?'

শওকত বলে, 'শাহিন ভাই, আমি যদি বুয়েটের কঠিন কঠিন পড়া বুঝতে পারি, যদি স্ট্রাকচার বুঝতে পারি, টেনিস বুঝতে পারব না?'

শাহিন ভাই বলেন, 'কথাটা তুমি যুক্তির কথাই বললা। তবে বুয়েটের ভালো ছাত্ররা তো আবার দুনিয়ার অন্য জিনিস বুঝতে চায় না।'

শওকত বলে, 'আমি তো দুনিয়ার অন্য কিছু বুঝতে চাচ্ছি না, শাহিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাই। আমি শুধু টেনিস খেলাটা বুঝতে চাইছি। টেলিভিশনে যখন টেনিস খেলা হয়, তখন সবাই রুম ছেড়ে চলে যায়। আমি বসে থাকি। খেলা দেখি। দুই দিন দেখছি। বুঝে গেছি।'

শাহিন ভাই বলেন, 'তুমি মিয়া একটা জিনিয়াস। টেনিস খেলা বুঝে ফেলছ।'

শওকত বলে, 'আপনি চাইলে আপনিও বুঝবেন।'

শাহিন ভাই বলেন, 'আমি চাই না।'

শওকত বলে, 'জি, সেটাই সমস্যা। আপনি চাইবেন না। আমি একটু শিখে রাখি। বোঝেনই তো...'

শাহিন ভাই বলেন, 'তুমি মিয়া টিচার হবা। তার প্রিপারেশন নিচ্ছ। ন্যাও।'

নিউ মার্কেটের বইয়ের দোকানের সামনে দিয়ে তারা হাঁটে।

শাহিন ভাই বলেন, 'চলো, ওইখানে চা খাই। দেখছ মিয়া, কী রকম সুন্দর একটা মেয়ে যাচ্ছে। ফিগারটা দেখছ না!'

শওকত লজ্জা পায়। সে বলে, 'শাহিন ভাই, আমি মেয়েদের দিকে তাকাই না।'

শাহিন ভাই বলেন, 'কী বলো মিয়া। তোমার যন্ত্রপাতি ঠিক আছে তো!'

শওকত বলে, 'শাহিন ভাই, আমি ধরেন গ্রামের ছেলে। আমার বাবা ছিলেন শিক্ষক। আমি বুয়েটে পড়ি। নিজেও টিচার হতে চাই। আমার কি মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকা উচিত?'

শাহিন ভাই বলেন, 'এটা তো উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন না। এইটা হলো গিয়া তোমার ন্যাচারাল ইন্সটিঙ্কট।'

শওকত বলে, 'ন্যাচারাল ইন্সটিঙ্কট দিয়ে চলবে পশুরা। মানুষ চলবে মানুষের তৈরি নিয়মকানুন দিয়া। সভ্যতা-ভব্যতা দিয়া।'

তারা নিউ মার্কেটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে।

শাহিন ভাই বলেন, 'এরশাদ সাহেবের কাণ্ড দেখছ। একটা মসজিদে গিয়া বলে, কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখছি, আপনাদের এখানে আমি নামাজ পড়ব। তাই আজকে এই মসজিদে চলে আসছি।'

শওকত বলে, 'স্বপ্ন তো একটা লোক দেখতেই পারে।'

শাহিন ভাই বলেন, 'আমার দুলাভাই আছে মিয়া পুলিশে। আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত দিন আগে বলে রাখছে, প্রেসিডেন্ট ওই মসজিদে আসবে, তারা সিকিউরিটি চেক করতেছে।'

'তা সত্ত্বেও একটা লোক গত রাতে মসজিদে নামাজ পড়ার স্বপ্ন দেখতে পারে।'

'তুমি মিয়া একটু বেশি সরল। একটু আগে বললা, মানুষের বেসিক ইন্সটিঙ্কট দিয়া চলা উচিত না। তোমার এরশাদ কী করতেছে মহিলাদেরকে নিয়া।'

'আমি তো এরশাদকে সমর্থন করি। এই যে আমার একপা খোঁড়া, এ জন্য তো এরশাদই দায়ী।'

ছাত্রদের টেনিস কোর্ট আর শিক্ষকদের টেনিস কোর্ট আলাদা।

শওকত ছাত্রদেরটাতেই যায়। আর আড়চোখে তাকিয়ে দেখে শিক্ষকদের কোর্টটা। তার পায়ে কেডস, সাদা হাফ প্যান্ট, সাদা টি-শার্ট।

তার সঙ্গে খেলতে এসেছে শাহান।

শাহান ঢাকার ছেলে। তার বাবা ময়মনসিংহের ডিসি। সে ছোটবেলা থেকেই টেনিস খেলে।

শাহান বলে, 'শওকত, এই যে তুমি টেনিস ব্যাট ধরলা, আজকে থেকে তোমার ক্লাস চেঞ্জ হয়ে গেল। তুমি বুর্জোয়া হয়ে গেলা।'

শাহান তিন বছর ফেল করা ছেলে। তিতুমীর হলেই অ্যাটাচড।

সেই হিসেবে শওকতের তিন বছরের বড়।

শাহান বলে, 'তোমার ইংলিশ কেমন? আর ইউ গুড অ্যাট ইংলিশ?'

'ইংলিশ তো মোটামুটি। বোঝেনই তো গ্রামের ছেলে।'

'তাইলে কেমনে হবে। টোয়েফল দিছ?'

'দেই নাই।'

'জীবনে কোনো ইংলিশ সিনেমা দেখছ?'

'না। তেমন না। এই তো আপনাদের সাথে বসে টিভিতে "টারজান", "বায়োনিক উইম্যান"—এই সব দেখছি। ডাল্লাস ডাইনাস্টি দেখার চেষ্টা করছি, ভালো লাগে নাই।'

'তুমি মিয়া যে টেনিস খেলতে আসছ, ইংলিশ না জানলে তো চলবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনার কথা ঠিক না, শাহান ভাই। আমি জানি, রাশান-স্প্যানিশ ছেলেমেয়েরা টেনিসে ভালো করে। তাদের তো ইংলিশ ভালো জানার কথা না।'

'তারা তো রাশান-স্প্যানিশ জানে। তুমি জানো?'

'জি না।'

'তোমার তো রেজাল্ট ভালো। তুমি টিচার হবা, তাই তো?'

'যদি ফোর্থ ইয়ার ফাইনালে রেজাল্ট ভালো করি। যদি নেয়।'

'তাইলে তো মিয়া তোমাকে আমেরিকা যাওয়া লাগবে। হায়ার স্টাডি করার জন্য।'

'জি, লাগবে।'

'তাইলে তো তোমাকে টোয়েফল-এ ভালো করতে হবে। টোয়েফল-এ ভালো করতে হলে তোমাকে লিসেনিং কম্প্রিহেনশনেও ভালো করতে হবে। হঠাৎ করে তো সেটা করা যায় না।'

'আপনি ভালো কথা মনে করেছেন, শাহান ভাই। আপনাকে ধন্যবাদ। আমি কালকে থেকেই ইংরাজি শিখতে লেগে পড়ব। ছোটবেলায় বাবা শেখাতেন। আমি ছোটবেলায় ইংরাজিতে ভালো ছিলাম।'

'শোনো, ছোটবেলার ইংরাজি দিয়া টোয়েফল-এর স্কোর ভালো করা যায় না। ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা গেল কোনো কাজে লাগে না।'

'আমি একটা কোচিং সেন্টারে তাইলে অ্যাডমিশন নিব। পেপারে তো বিজ্ঞাপন দেখি।'

'নাও। আরেকটা কাজ করতে পারো। আমারে ১০ হাজার টাকা দিতে পারো। তাইলে আমি তোমার নামে টোয়েফল দিয়ে দিব। ম্যাক্সিমাম স্কোর গ্যারান্টিড। আমি প্রত্যেকবার পরীক্ষা দেই।'

শওকত বলে, '১০ হাজার টাকা আমি কই পাব, শাহান ভাই। দরকার নাই। আমি নিজেই পারব।'

'আচ্ছা যাও, তোমার জন্য ৫ হাজার।'

'না, শাহান ভাই। আমি অসততা করতে পারব না। আমি নিজে নিজে পারলে পারলাম। তা না হলে ধরেন মনবসু স্কলারশিপ নিয়ে জাপান যাওয়ার চেষ্টা করব। ওখানে তো ইংলিশ লাগবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহান বলে, 'তুমি তো মিয়া আশ্চর্য বোকা। আমি তোমারে টোয়েফল-এর স্কোর এনে দিলেই তো হলো।'

'জি না, হলো না। আপনি এক কাজ করেন। আমাকে টেনিস খেলা শেখান।'

'আচ্ছা, যাও। তোমারে সার্ভ করা শেখাই। নাও। বলটা আকাশে ছুড়ে মেরে ট্রাই করো।'

শওকত গ্রামের ছেলে। হাতে-পায়ে জোর আছে। অল্পতেই সে ভালো করতে শুরু করল। নেশায় নেশায় সে বেশি বেশি খেলে ফেলে। দুদিন পর সে বুঝতে পারে, তার পায়ে ব্যথা শুরু হয়েছে।

পায়ে ব্যথার কারণে তার টেনিস খেলায় ছেদ ঘটে। কিন্তু সে চলে যায় ইউসিসে। ধানমন্ডি নয় নম্বর রোডে মাঠের পাশে ইউসিসের লাইব্রেরিতে ঢুকে সে জানতে চায়, টোয়েফল সম্পর্কে কোথায় জানা যাবে। টোয়েফল-এর বই কেনে নীলক্ষেত থেকে, ক্যাসেট কেনে, তারপর দুই হাজার দুই শ টাকা দিয়ে কেনে একটা ক্যাসেট প্লেয়ার।

শুরু হয় তার ইংরেজি শেখার সংগ্রাম।

বাবার একটা ফটো ছিল তার কাছে, সেটাকে সে একটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে তার পড়ার টেবিলে রাখে। এই বাবার ছেলে ইংরেজি পারবে না, এটা হতেই পারে না।

সে বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে, একদিন, যখন তার রুমে কেউ নাই, বলতে থাকে, বাবা, আমার সামনে দুইটা উপায় আছে, একটা হলো, টোয়েফল-এর স্কোর কিনে ফেলা, আরেকটা হলো নিজেকে যোগ্য করে তোলা। আমি তোমার মান রাখতে চাই, নাম রাখতে চাই, আমি দ্বিতীয় পথটাই নিলাম। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, বাবা, আমি কোনো দিনও অন্যায় কিছু করব না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবীর মনোয়ারা ক্লিনিকের বারান্দায় পায়চারি করছে।

পরশ আর পৃথ্বীর মা ভেতরে। ওটিতে।

একটা কাঁঠালচাপার গাছ দোতলার বারান্দার সমান্তরালে। তাতে ফুল ফুটে আছে। সুন্দর গন্ধ।

আবীরের হাত ধরে আছে পরশ। সকাল সাড়ে নয়টার মতো বাজে। বাইরে ঝকঝক করছে রোদ। কতগুলো টুনটুনি পাখি কাঁঠালচাপার ডালে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ছে।

পরশ বলে, 'স্যার, মাকে কোথায় নিল, স্যার।'

আবীর বলে, 'মাকে ওটিতে নিল।'

'ওটি মানে কী, স্যার।'

'ওটি মানে অপারেশন থিয়েটার।'

'অপারেশন থিয়েটারে মাকে কেন নিল, স্যার।'

'মায়ের পেটে তোমাদের একটা বোন আছে। তাকে বের করা হবে।'

'পেট কেটেই কি স্যার বাচ্চা বের করতে হয়?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকেও কি পেট কেটে বের করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'পৃথ্বীকেও কি পেট কেটে বের করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'পেট কী দিয়ে কাটে, স্যার?'

'মনে হয় নাইফ দিয়ে।'

'পেট কাটলে কি রক্ত বেরোয়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ।'

'পেট কাটলে কি মানুষ মারা যেতে পারে?'

আবীর চমকে ওঠে। শানু কি মারা যেতে পারে? তার ভয় লাগছে। সবাই বলে, দুইবারের বেশি সিজারিয়ান অপারেশন করতে হয় না। শানুর এটা তিন নম্বর। শানু আবীরের সন্তান পেটে নিতে চেয়েছে। তাই সে এই বাচ্চাটাকে ধারণ করেছে।

পরশ আর পৃথ্বীর বাবা অবশ্য তা জানেন না। তিনি জানেন, এটা তাঁরই বাচ্চা। ফারুক সাহেবকে আবীরের ভদ্রলোকই মনে হয়েছে। সহজ-সরল। খিলখিল করে হাসেন। স্লিম শরীর। গায়ের রংটা একটু চাপা। উজ্জ্বল চোখ। বেশ লম্বা।

তাঁর সঙ্গে আবীরের দেখা হয়েছে।

আবীর এখন পরশের শিক্ষক।

পরশের মা অসুস্থ। তাঁর উঁচু পেট নিয়ে তিনি সবদিক সামলাতে পারেন না। তাই তিনি একজন গৃহশিক্ষক রেখে দিয়েছেন পরশের জন্য। শিক্ষকের নাম আবীর। তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যাভাল আর্কিটেকচারে পড়েন।

আবীর স্যার খুব ভালো। তিনি পরশকে পড়ান। পরশকে মাঝেমধ্যে স্কুল থেকেও আনেন।

মাঝেমধ্যে ফারুক সাহেবের সঙ্গে তাস খেলেন।

খুব সুখেই যাচ্ছে ফারুক সাহেবের সংসারের দিনকাল।

এখন ফারুক সাহেব জাহাজে। মেরিন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব উপস্থিত থাকতে পারছেন না স্ত্রীর সন্তান প্রসবের সময়।

ডিউটি দিচ্ছেন পরশের গৃহশিক্ষক।

আবীর হাঁটছে। পায়চারি করছে। সিনেমার দৃশ্যের মতোই। লেবার ওয়ার্ডের সামনে যেমন করে চিন্তিত ভাবী পিতারা পায়চারি করে।

ভেতরে শানুকে অজ্ঞান করা হয়েছে। ক্লিনিকের কাগজে সন্তানের পিতার নাম লেখা হয়েছে ফারুক হোসেন।

কিন্তু বাচ্চার বাবা আসলে কে?

শানু আবীরকে বলেছে, বাচ্চার বাবা আবীর।

শানু ফারুককে বলেছে, বাচ্চার বাবা ফারুক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে বাচ্চা কার, তা কেবল ওপরওয়ালা জানেন।

পরশ কাঁদো কাঁদো গলায় আবার বলল, 'স্যার, মা কি মারা যেতে পারেন?'

আবীর বলে, 'না, মারা যাবে কেন?'

'আমার ভয় লাগছে, স্যার।'

'ভয় পেয়ো না। আল্লাহকে ডাকো।'

'কীভাবে ডাকব?'

'বলো, আল্লাহ, আমার মাকে ভালো রেখো।'

পরশ বলে, 'আল্লাহ আমার মাকে ভালো রেখো।'

'গুড।'

একটু পরে নার্স এসে বলে, 'কংগ্র্যাচুলেশনস। আপনার ছেলে হয়েছে।'

মেয়ে হওয়ার কথা। ছেলে হয়েছে। হতেই পারে। ডাক্তাররা সব সময় ঠিক বলেন না।

'আজান দেন। আর মিষ্টি আনেন।'

আবীর অজু করতে যায় বাথরুমে। সঙ্গে পরশ।

'স্যার, আপনি কী করছেন?' পরশ বলে।

'অজু করছি, বাবা।'

'অজু করছেন কেন?'

'আজান দেব।'

'আমিও আজান দেব।'

'তাহলে তুমিও অজু করো।'

গুরু-শিষ্য অজু করে আসে।

তারপর বারান্দায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আবীর আজান শুরু করে—'আল্লাহু আকবার'।

আজান দেওয়া শেষ করে আবীর ভাবে, তাহলে ছেলের বাপ হইয়া গেলাম!

সিস্টারের কোলে বাচ্চাটা, তাকে কই নিয়ে যাচ্ছে?

'সিস্টার, ওকে কই নিয়ে যান?'

সাদা পোশাকের সেবিকা মুখে হাসি ফুটিয়ে বাচ্চার মুখটা আবীরকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখাতে দেখাতে বলেন, 'কেবিনে লই। শোনেন, ছেলের বাবা হইছেন, মিষ্টি আনেন বেশি করে।'

পরশ বলে, 'ওরা ভেবেছে, স্যার, আপনি আমাদের বাবা।'

আবীর পরশের মুখের দিকে তাকায়। মনে মনে বলে, আমি তো তোমার বাবা না, ওই সদ্যোজাত শিশুটার বাবা। মুখে সে কিছুই বলে না।

ভেতর থেকে আরেকজন সিস্টার এসে বলেন, 'আপনাদেরকে ভিতরে ডাকে।'

আবীর বলে, 'পরশ, মাকে দেখতে যাবে?'

'জি স্যার।'

'চলো।'

তারা দুজন ভেতরে প্রবেশ করে। ওটিতে। ততক্ষণে শানুর সেলাই হয়ে গেছে। বেডের মাথার কাছে দাঁড়ায় আবীর আর পরশ।

শানুর জ্ঞান আছে। তার শুধু নিচের অংশ অবশ করা হয়েছে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখে একটা প্রশান্তির হাসি।

শানু হাত বাড়িয়ে দেয়। আবীর ইতস্তত করছে। এত লোকের সামনে কি শানুর হাত তার ধরা উচিত? পরশই বা কী ভাববে?

কিন্তু এখনই তো সেই সময়, এখন একজন পুরুষ একজন নারীর হাত ধরতে পারে।

আবীর হাত বাড়িয়ে শানুর হাতটা নিজের মুঠোয় পুরে নেয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত মহা বিরক্ত।

বিশ্ববিদ্যালয় আবারও বন্ধ অনির্দিষ্টকালের জন্য।

হলগুলো খালি করে দেওয়া হয়েছে বাধ্যতামূলকভাবে।

শওকত বাড়ি যায়।

মায়ের সঙ্গে দেখা। তার মা, মলিন শাড়ি, সাদা পাকা চুল, সংসারের নিত্যদিনের ঘানিটা যেন টেনেই চলেছেন, তাকে দেখে খুব খুশি হন।

সে বাড়ির দাওয়ায় ওঠে সকালবেলা। হেমন্তের সোনারোদ তখন পাতায় পাতায় পিছলে পড়ছে। বাড়ির দাওয়ায় ছড়ানো বিচালিতেও প্রতিফলিত হচ্ছে রৌদ্ররশ্মি, কমলা রঙের বাছুরটার লকলকে কানে; হঠাৎ লাফিয়ে বেড়ার গায়ে ওঠা বিড়ালের লেজেও রোদের ঝলক।

মা তখন থালাবাসন নিয়ে ব্যস্ত কলতলায়।

বাজে পোড়া তালগাছটার নিচে রিকশাভ্যান ছেড়ে পিঠের মধ্যে ট্রাভেল ব্যাগটা তুলে হেঁটে আসে শওকত। বাড়ির পেছনের শটি, ঢেঁকিশাক, ঢোলকলমি ঢাকা শর্টকাট পথটা বেয়ে এসে ওঠে দাওয়ায়।

একটা মোরগ শাঁই করে ছুটে যায়, আর তাকে দেখে ঘাড়ের পালক ফুলিয়ে তেড়ে আসে ছানাসমেত চরে বেড়ানো একটা মুরগি।

শওকতকে দেখেই ছুটে আসেন মা। তার হাত তখনো ভেজা। আঁচলে হাত মুছে তিনি ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন।

পান খাওয়া দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলেন, 'বাবা, কোনো খবর না দিয়াই চলি আসলা। খুব ভালো করছ।'

শওকত বলে, 'খবর দেওয়ার টাইম পাই নাই। ভার্সিটি বন্ধ করি দিছে। উপায় না পায়া চলি আসলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খুব ভালো করছ। যাও। ব্যাগটা থুয়া হাতমুখ ধোও। নাশতা দেই।'

শওকত শরীর ছেড়ে দিয়ে হাসে। দীর্ঘশ্বাস মাখা হাসি। মা আছেন নাশতা নিয়ে। ছেলেকে পেয়েছেন, তাতেই খুশি। তার যে ক্লাস বন্ধ, পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে, পাস করে বেরোনোর সময়টা পিছিয়ে যাচ্ছে, মা এসবের কিছুই বুঝবেন না।

শওকত ঘরে যায়।

ঘরের এক কোণে ধানের বস্তা।

পাটের স্তূপ।

সেসবের গন্ধ।

এ তার শৈশবের গন্ধ।

তবু তার যেন কেমন একটা ধাক্কা লাগে।

সে টোয়েফল দিয়েছে। স্কোর ভালো করেছে। সেটা জানার পর টেনিসের র‍্যাকেট হাতে, সাদা শর্টস আর টি-শার্ট পরে সে গিয়েছিল টেনিস কোর্টে।

শাহান ছিল সেখানে।

আর ছিল ফার্স্ট ইয়ার ইলেকট্রিক্যালের ছাত্রী বহ্নি।

বহ্নি মানে আগুন।

বহ্নি দেখতে আগুনের মতোই।

তার কোমরটা সরু, মনে হয় ছয় ইঞ্চি। এদিক-ওদিক হতে পারে, সঠিক মাপ জানতে স্লাইড ক্যালিপার্স লাগবে।

তার উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি হবে, আটও হতে পারে।

তার কোমর সরু হলেও বালুঘড়ির মতো ফিগার।

তার গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল ফরসা।

শুকচঞ্চু নাক।

মানে হলো, টিয়া পাখির ঠোঁটের মতো নাক। টিয়া পাখির ঠোঁটের মতো নাক খুব সুন্দর কিছু হওয়ার কারণ নাই। বাঁশির মতো নাক বরং ভালো তুলনা। কিন্তু বাঁশির মতো নাক বলতে আসলে কোন ধরনের বাঁশিকে বোঝায়, শওকতের ধারণা নাই।

তার চোখ দুটো টানা টানা। অনেকটা দুর্গাপ্রতিমায় যে ধরনের চোখ আঁকা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই মেয়েটির বাবা পুলিশের ডিআইজি।

তিনি গল্প লেখেন। সেসব গল্পে সেক্সের ছড়াছড়ি, বুয়েটের ছেলেরা বলাবলি করে থাকে।

বহ্নি খেলছিল শাহানের সঙ্গে।

শওকত যায় সেখানে।

অন্য কোনো কথা না বলে প্রথমেই সে শাহানের উদ্দেশে চিৎকার করে বলে, 'শাহান ভাই, টোয়েফলের স্কোর এসে গেছে। ৫৬০ পেয়েছি।'

'কী কও? কেমনে?'

'লিসেনিংয়ে সবচেয়ে খারাপ করছি। সবচেয়ে ভালো করছি স্পিকিংয়ে।'

'কেমনে করলা?'

'ছোটবেলা থেকেই ইংরেজিতে কথা বলতে হয়েছে, শাহান ভাই। বাবা টিচার ছিলেন।'

'আচ্ছা। গ্রেট।'

বহ্নি বলে, 'আরি, আমি তো ৫৩০ পেয়েছিলাম। অবশ্য তখন ছোট ছিলাম তো! এখন হয়তো ভালো করব।'

শাহান বলে, 'বহ্নি, তুমি শওকতের সঙ্গে খেলো। শওকত তো টিচার হচ্ছে আর কিছুদিন পরে, ওর সাথে খেললে সেটা তোমার কাজে লাগবে।'

বহ্নি বলে, 'শওকত ভাই, আপনি কোন ডিপার্টমেন্ট?'

'সিভিল,' শওকত বলে।

'ও আচ্ছা। আমি তো ইলেকট্রিক্যাল।'

শওকত বল সার্ভ করে। বহ্নি সেটা ফিরিয়ে দেয় চমৎকার দক্ষতায়।

বহ্নির পায়ে কেডস, পরনে সাদা ট্রাউজার, গায়ে টি-শার্ট। মাথায় সে বেঁধেছে টেনিস খেলার ব্যান্ড।

বহ্নি সার্ভ করে। শওকত সেটাকে ফিরিয়ে দিতে পারে না।

বহ্নি বলে, 'পয়েন্ট।'

শওকত হাসে।

শাহান বলে, 'বহ্নির সাথে ম্যাচ খেলো, শওকত।'

বহ্নি বলে, 'আসেন খেলি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহান বলে, 'তুমি আর বহ্নি পারফেক্টলি ম্যাচড।' বলেই শাহান হো হো করে হাসতে লাগল।

শওকতের পায়ের ব্যথাটা যেন চাগান দিয়ে উঠল।

শওকত বলে, 'না, আজকে ম্যাচ খেলব না। কদিন প্র্যাকটিস করে নিই। তারপর খেলব।'

শওকত খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

'কী হলো?' বহ্নি এগিয়ে আসে।

'পায়ে ব্যথা।'

'কীভাবে হলো? এখনই হলো?'

'না।'

'তাহলে?'

'এরশাদ সাহেবের পুলিশের কীর্তি। ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ক্যাম্পাসে ঢুকে আমাদের মার দিয়েছিল। সেদিনই পা ভেঙে যায়।'

'আপনি আন্দোলন করেছিলেন?'

'না। আমি রাজনীতি করি না।'

বহ্নি বলে, 'আপনার পা তো বেশ ফুলে গেছে। আপনার খেলার দরকার নাই। বরফ দিন। বরফ দিলে ভালো হয়ে যাবে।'

বহ্নি তার ফোলা জায়গাটায় তর্জনী দিয়ে টিপে বলে, 'ব্যথা করে?'

বহ্নির নখে হালকা সোনালি রং।

বহ্নির শরীর থেকে ভেসে আসছে পারফিউমের সুগন্ধি।

কোথায় বহ্নির সৌরভ আর কোথায় এই ঘরে পাট আর ধানের গন্ধ।

মানুষের জীবনে কত বৈপরীত্য!

ঘরে ব্যাগ রেখে শওকত শৌচাগারে যায়। কল থেকে বদনায় পানি নিয়ে ছোটে পায়খানার দিকে। তাদের স্যানিটারি ল্যাট্রিন। আরসিসির রিংয়ে তৈরি।

আর সে টেনিস খেলতে যায় বুয়েটের টেনিস কোর্টে।

দুদিন আগে কই ছিল, আজ এখন সে কোথায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিউবওয়েলের পারে গোসল সারে। মা গৃহপরিচারিকা ময়নার মাকে বলেন বালতিতে পানি তুলে দিতে। শওকত বলে, 'না মা, লাগবে না। আমি নিজেই তুলে নিতে পারব।'

লাইফবয় সাবান দিয়ে গোসল করে সে। ভেজা শরীরে খোলা প্রান্তরের বাতাস এসে লাগে। গোসল সেরে তোয়ালে দিয়ে গা মোছে।

এই গ্রামে তোয়ালেও বেমানান।

এখানে লাল রঙের গামছারই চল।

গরুর গরম দুধ আর মুড়ির মোয়া। মা নাশতা বেড়ে দেন বারান্দার টেবিলে। বেঞ্চে বসে সেই দুধ-মুড়ি খেতে ভালোই লাগে।

নাশতা করার পর শওকতের চায়ের তেষ্টা পায়।

মা বলেন, 'চা-পাতি নাই, শওকত। শেষ হয়া গেছে। আনা হয় নাই। বিকালে চা খাইও।'

'জি আচ্ছা, মা। কোনো ব্যাপার না। আমি বিকালে বাইর হব। চা-পাতি আনব। আর কী কী লাগবে, বলো।'

মা মুরগি ধরতে বলেছেন। ও বাড়ি থেকে আসগার এসেছে, ময়নার মা প্রস্তুত। একটা মোরগ বা মুরগি ধরা হবে।

শওকত বলে, 'মা, দুপুরে মুরগি পাক করা লাগবে না। কালকে সকালে মুরগি ধরো। এখন যা আছে, তা-ই দাও।'

মা বলেন, 'এখন তো বাবা তেমন কিছু নাই। আমি একলা মানুষ। আমার জন্য তো পাক করি না তেমন কিছু। একনা ডাইল একনা শাকপাতা হইলেও হয়া যায়। আচ্ছা দেখি, ডিম করি দেই।'

নাশতা করে শওকত যায় বাঁশঝাড়ের নিচে।

বাঁশের শুকনো পাতা ঝরে পড়ে বাঁশতলা ছেয়ে আছে।

বাবার কবরটার বাঁশের বেড়া পুরোনো হয়ে গেছে বেশ।

কবরের ওপরেও ঝরা বাঁশপাতার পুরু স্তর।

সে কবর জিয়ারত করে। দোয়া করে আল্লাহপাকের দরবারে, 'হে আল্লাহ, আমার বাবাকে বেহেশত নসিব করো।'

বিকালে শওকত বের হয়। মাকে কিছু বাজার-সদাই করে দেওয়া দরকার। মার জন্য সে এবার কিছুই আনতে পারেনি। ইউনিভার্সিটি হঠাৎই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ক্লোজড সিনে ডাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এরশাদের ঘোষণা, ছাত্রসমাজ মানে না' স্লোগান দিতে দিতে তারা চলে আসে বাসটার্মিনালে, রেলস্টেশনে। মার জন্য কিছু যে একটা কিনবে, উপায় ছিল না।

বাবু মিয়ার দোকানে আসে শওকত।

মুদির দোকান। বটগাছের নিচে।

টংয়ে বসে আছে কয়েকজন যুবক।

তারা শওকতকে দেখে বিড়ি লুকোনোর প্রয়াস পায়।

শওকত কাছে যেতে তারা সালাম দেয়।

একজন বলে, 'ভাইজান, কখন আসলেন?'

'এই তো সকালে।'

'ঢাকার সব স্কুল-কলেজ বন্ধ করিয়া দিছে, বাহে?'

'হ্যাঁ।'

'কালকা কী হইবে?' আরেকজন জিগ্যেস করে। কথার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল সিগারেটের ধোঁয়া।

'কালকা তো ঢাকা অবরোধ। সারা দেশ থেকে মানুষ যাবে ঢাকা। আমাদেরকে তো হল থেকে বাইর করি দিল। আর ঢাকাত যাওয়ার রাস্তাঘাটও সব বন্ধ করি দিছে।'

'তাইলে কি অবরোধ হবে না?' একজন জিগ্যেস করে।

'ঢাকাতেই তো ৫০ লাখ মানুষ আছে। তারা বাইর হইলেই হবে,' শওকত জবাব দেয়।

'সরকার এত ভয় পাইছে ক্যান?' আরেকজন প্রশ্ন করে।

'মনে হয়, হাসিনা আর খালেদা মিটিং করাতেই এরশাদ ভয় পায়া গেছে,' শওকত জবাব দেয়।

শওকত রাজনীতির খোঁজ কখনোই নিত না। কিন্তু অকারণে পুলিশের পিটুনি খেয়ে পা ভাঙার পর থেকেই সে তীব্র এরশাদ-বিরোধী হয়ে পড়েছে। এখন খোঁজখবর নেয়। বিরোধীদের আন্দোলন দেখলেই সে আগ্রহবোধ করে। তার মনের মধ্যে একটা প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে।

'দুই নেত্রী মিটিং করলে কী হয়?' একজন যুবক দুই হাত একত্র করে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে শুধোয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শাহ মোয়াজ্জেম তো বলেই দিছে, দুই মহিলা মিলিত হলে কিছুই উৎপাদিত হয় না'— শওকত বলে।

ছেলেরা হেসে ওঠে হো হো করে।

শওকত চায়ের পাতা কেনে। মার জন্য কী কিনবে তা-ই ভাবতে থাকে। এই দোকানে মার জন্য কিছু পাওয়া যাবে না। মাইল খানেক দূরে একটা বাজার আছে, সেখানে যেতে হবে। মার জন্য একটা শাড়ি কেনাই ভালো। তাহলে বোধ হয় রংপুর যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপাতত সে মার জন্য কিছু জিলাপি কিনে নিলেই পারে। সে আরেকটু হেঁটে বাজারের জিলাপির দোকান পর্যন্ত যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

বাঁশের খাঁচাড়িতে করে জিলাপি নিয়ে ফেরে শওকত।

বাড়ির দাওয়ায় আসতে আসতে সন্ধ্যা নেমে আসে চরাচরে।

গরুর পাল ফিরছে ধূলি উড়িয়ে, গোধূলি কথাটাকে সার্থক প্রমাণ করার জন্য। ছেলেপুলের দলও ধান উঠে যাওয়া খেতে ফুটবল খেলে এক হাঁটু ধুলা নিয়ে যার যার ঘরে ফিরছে হইচই করতে করতে। পশ্চিম আকাশে মেঘের রঙিন আস্তরণ।

এই সময়টাকে বলা হয় কনে দেখা ক্ষণ।

এই আলোটাকে বলা হয় কনে দেখা আলো।

এই হলুদ আলোয় সবকিছুকে উজ্জ্বল বলে বোধ হয়!

এমনি কুহেলিময় এক প্রদোষে শওকত দেখে, তাদের বাড়ির দাওয়ায় একটা অপূর্ব নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে। উজ্জ্বল কমলা রঙের শাড়ি, দিঘল কেশ, পিতলের মূর্তির মতো মুখশ্রী।

শওকতের বুকটা কেঁপে ওঠে।

তাকে দেখামাত্রই সেই নারীমূর্তি অন্তর্হিত হয় রান্নাঘরে।

শওকত এগিয়ে যায়।

ব্যাপার কী?

মেয়েটা কে?

শওকত আরেকটু এগোয়। বারান্দায় ওঠে। ইটের গাঁথুনি দেওয়া প্লিনথ। মেঝেতে মাটি। দেয়ালে ইট। প্লাস্টার আছে। চুনকাম করা হয়নি।

শওকত বারান্দার টেবিলে রাখে জিলিপির ঠোঙা।

মাকে ডাকে, 'মা, মা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই নারীমূর্তি এগিয়ে আসে।

বলে, 'চাচি আম্মা নামাজে বসছে।'

মার এ আবার কোন ভাইঝি? শওকত মনে মনে হিসাব কষে। হিসাবের কোনো ফল ফলছে না।

'আপনি চা-পাতি আনছেন? দেন। চাচি আম্মা আপনাকে চা বানায়া দিতে বলছে।'

শওকত টেবিলের ওপরে রাখা জিলাপির ঠোঙার পাশ থেকে চায়ের পাতার প্যাকেট তুলে নিয়ে বলে, 'এই যে চা-পাতি। জিলাপিও আছে।'

শওকত বারান্দার বেঞ্চে বসে। ঘরের দরজার গোড়ায় কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বালানো হয়েছে। তবে সলতে উসকে দেওয়া হয়নি।

এখনো অন্ধকার প্রবল নয়। আলোই এখনো কর্তৃত্ব করছে অন্ধকারের ওপরে।

কিন্তু কেরোসিনের গন্ধ ছড়িয়ে আছে বাতাসে।

মা নামাজ পড়বেন অনেকক্ষণ ধরে। নামাজ শেষে পড়বেন দোয়াদরুদ।

চায়ের গন্ধ আসছে রান্নাঘরের ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে।

শওকতের শরীর চায়ের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে।

কিন্তু তার মনটা কাঙ্ক্ষা করছে ওই কমলা শাড়ি নারীটিকে।

হাতে চায়ের কাপ নিয়ে মেয়েটি আসে।

আরেক হাতে জিলাপি।

টেবিলে সেসব রেখে সে বলে, 'আমি পানি আনতেছি এখনই।'

সে চলে যায় রান্নাঘরে।

কাঁসার গেলাসে পানি ঢেলে ফিরে আসে চটপট।

তার হাতে একগাছা সোনার চুড়ি!

মেয়েটি দরজার মুখ থেকে লণ্ঠনটা তুলে আনে। আলোর তেজ বাড়িয়ে দেয় চাবি ঘুরিয়ে। তার মুখখানা আবারও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে লণ্ঠন রাখে টেবিলে।

শওকত বলে, 'তোমার নাম কী?'

'আমার নাম সোনিয়া।'

'কোন বাড়ি তোমার?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তালুকদার বাড়ি। আমি নুরুল বিএসসির মেয়ে।'

'তুমি নুরুল স্যারের মেয়ে। নুরুল স্যারের কাছে অঙ্ক পড়ছিলাম। খুব ভালো বুঝাইতেন। স্যার কেমন আছেন?'

'জি, ভালো আছেন।'

'তুমি কী পড়ো?'

'আমি বদরগঞ্জ কলেজে আইএসসি পড়ি।'

'বাহ্।'

'আমার স্ট্যাটিকস বুঝতে অসুবিধা হয়। আব্বা বলছেন, আপনি আসলে আপনার কাছ থেকে বুঝায়া নিতে।'

'তা তোমার আব্বা ভালোই বলছেন। আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ায় তো খালি এই স্ট্যাটিকস।'

শওকতের মা আসেন। বলেন, 'সোনিয়া, চা দিছ মা তোমার ভাইজানক?'

'দিছি চাচি আম্মা। আপনার জন্য ভাইজান জিলাপি আনছে। নেন, খান।'

'তুমি খাইছ?'

'আপনি না খাইলে ক্যামন করি খাই, চাচি আম্মা', সোনিয়া বলে।

'যাও। তাইলে নিয়া আসো পাকঘর থাকিয়া।'

সোনিয়া রান্নাঘরের দিকে যায়। মা গলা উঁচিয়ে বলেন, 'পাকঘরত ল্যাম্পোটা আছে। জ্বালেয়া ন্যাও, মা।'

তারপর ফিসফিস করে বলেন, 'মেয়ে তো নয়, ফেরেশতা। এই বাড়িতে আমি একলা একলা থাকি। এই মেয়েই আসিয়া আমার খোঁজখবর নেয়। নিজের বেটিও এই রকম খোঁজখবর করে না।'

এক হাতে ল্যাম্প আরেক হাতে জিলাপিভরা থালা নিয়ে সোনিয়া ফেরে।

টেবিলে রেখে বলে, 'চাচি আম্মা, নেন, খান।'

'তুমি খাও, মা।'

'আমি পরে খাব।'

'কেন, পরে খাবা কেন?'

'না, পরে খাব', বলে সে সামনে থেকে চলে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা বলেন, 'দেখলা কী রকম আদব। তোমার সামনে খাবে না। তাই খাইল না।'

শওকতের মনে পড়ছে বহ্নির কথা। বহ্নি তার পায়ের ফোলা জায়গায় তর্জনী বুলিয়েছিল।

রাত্রি পৌনে আটটা এই গ্রামে অনেক রাত।

সবার খাওয়া হয়ে গেছে।

শওকত বলে, 'রেডিওটা কই আমাদের?'

মা বলেন, 'তোর বাবা মরার পর তো সেইটার কোনো খোঁজখবর নাই।'

'আরে বিবিসি শোনা দরকার ছিল। কালকা ঢাকায় ঘেরাও। কী হয় না-হয় শুনি।'

'যা, তোর নুরুল বিএসসি স্যারের বাড়ি যা। অরা খুব খবর শোনে। সোনিয়ার সাথে যা। সোনিয়া, ও সোনিয়া। ভাইজানক বাড়িত নিয়া যাও। ভাইজান রেডিওতে খবর শুনিবে।'

ঝিঁঝি ডাকছে।

জোনাকি জ্বলে উঠেছে এদিক-ওদিক।

শেয়ালের ডাক আসছে কাশবনের দিক থেকে।

গৃহস্থ বাড়িগুলো থেকে আসছে কুকুরের ঘেউ ঘেউ রব।

সোনিয়ার হাতে একটা টর্চলাইট।

তার পেছন পেছন হাঁটছে শওকত।

সোনিয়ার গা থেকে একটা বুনো গন্ধ আসছে। শওকতের মাতাল মাতাল লাগছে।

মাথার ওপরে বাঁশঝাড়। কী যেন নড়ে ওঠে বাঁশঝাড়ে।

শওকতের বুক কাঁপে। সে সোনিয়ার নিকটবর্তী হয়। সোনিয়ার শরীর থেকে কেরোসিনের গন্ধ আসে। শওকতের কেমন যেন লাগে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কা-কা—কাক ডাকে।

কাকডাকা ভোর। নূর হোসেন শুনতে পান ভোরের প্রথম ডাকটাই।

এরপর আজান শুরু হয় মসজিদের মাইকে।

বেশ কয়েকটা মসজিদের আজান শোনা যায় বনগ্রামের এই বস্তিঘরটায়।

বাবা উঠে পড়েন। তিনি নামাজ পড়বেন।

মা-ও উঠে পড়বেন এক্ষুনি। পাশে শুয়ে আছে তার ভাইয়েরা, বড় ভাই আলী (২৭), ছোট ভাই দেলোয়ার (২২), তার ছোট আনোয়ার (১৮)। সবচেয়ে ছোট বোন সাহানা (১৪) ওই দেয়ালঘেঁষা তক্তপোশে শোয় মায়ের পাশে।

একটাই তাদের ঘর। এই ঘরেই জন্ম নিয়েছে সাহানা। মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই তারা এই ঘরে আছে।

আলী ভাই ট্রাকভ্যান চালায়। দেলোয়ার মিনিবাসের হেলপার। আনোয়ার কাজ শিখছে লেদমেশিনে। বাবা বেবিট্যাক্সি চালান।

আর নূর হোসেন (২৪) নিজেও গাড়ি চালানো শিখেছেন। এখন বড় ভাইয়ের ট্রাকের সঙ্গে উঠে পড়েন হেলপার হিসেবে। মাঝেমধ্যে তাঁকেও স্টিয়ারিং ধরতে হয়।

কাল সারা রাত নূর হোসেনের ভালোমতো ঘুম হয়নি।

মাথার মধ্যে নানা ধরনের ভাবনা ভাতের হাঁড়ির মতো টগবগ করে ফুটছে।

এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক এসেছে। আগামীকাল ঢাকা অবরোধ। 'চলো চলো, ঢাকা চলো' কর্মসূচি। সরকার এই কর্মসূচি বানচাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে চায়।

সরকার এরই মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করেছে। পাঁচজনের বেশি লোক একসঙ্গে জড়ো হতে পারবে না।

ঢাকার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সব ছাত্রাবাস থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের।

ঢাকার দিকে কোনো ট্রেন আসতে দেওয়া হচ্ছে না।

ঢাকাগামী লঞ্চগুলো আসাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ঘাটে ঘাটে।

রাস্তায় রাস্তায় পাহারা দিচ্ছে পুলিশ বিডিআর।

কিন্তু যে করেই হোক তাঁরা মিছিল করবেনই।

নূর হোসেন বিছানা ছাড়েন।

বাবা নামাজে। মা অজু করছেন।

মায়ের অজু হয়ে গেলে কলতলায় যান নূর হোসেন। হাত-মুখ ধোন।

তারপর লুঙ্গি ছেড়ে প্যান্ট পরেন।

মা জায়নামাজে বসেই বলেন, 'নূর হোসেন, কই যাস?'

'আসতেছি মা।'

'আসতেছি মা মানে। নাশতা খায়া যা।'

'আইসা খামু।'

রাত থেকে একই শার্ট পরা নূর হোসেন। লাল রঙের শার্ট। শার্টটা তিনি খুলছেন না।

কারণ, শার্টের নিচে তিনি বুকে পিঠে লিখে এনেছেন স্লোগান।

তার বুকে লেখা :

স্বৈরাচার নীপাত যাক।

পিঠে লেখা : গনতন্ত্র মুক্তি পাক। (ওই স্লোগানে 'নিপাত' ও 'গণতন্ত্র' বানান ওই রকমই ছিল।)

লিখে দিয়েছেন আর্ট হ্যাভেনের সাইনবোর্ড আর্টিস্ট ইকরাম ভাই। মতিঝিলে ক্যাফে চায়নার গলিতে তার দোকান।

রাতের বেলা, দোকান বন্ধ হওয়ার আগে আগে নূর হোসেন যান তার কাছে। তেলরঙের গন্ধ, এখানে-ওখানে রঙের ছোপছাপ—দু-একটা সাইনবোর্ডের কাঁচা রং শুকানোর জন্য বাইরে রাখা— এই হলো আর্ট হ্যাভেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইকরাম ভাইয়ের শার্টেও রঙের দাগ। তাকে ধরে নিয়ে গেছেন নূর হোসেন, 'চলেন তো একটু দোকানের বাইরে, গলির ভেতরে।'

'আরে কী কইবা, কইয়া ফেলো না'—ইকরাম ভাই বলেন।

'ইকরাম ভাই, আমার বুকে লেখেন, স্বৈরাচার নিপাত যাক; পিঠে লেখেন, গণতন্ত্র মুক্তি পাক।'

ইকরাম বলেন, 'এই লেখা দিয়া কী করবা?'

'কাইলকা মিছিলে যাব।'

'তোমার মাথা খারাপ। এইটা দেখলে তোমারে পুলিশে ধরব। তুমি গ্রেপ্তারি এড়াইতে পারবা না।'

'ধরলে ধরব। দেখব, দেশের জনগণ কী চায়, স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক, এইটা সবার মনের কথা।'

'তোমার জেল হইব।'

'হইলে হইব।'

'তোমারে তো পুলিশ গুলিও করতে পারে। মনে নাই, পুলিশ মিছিলে ট্রাক তুইলা দিছিল। সেলিম, দেলোয়ারের ট্রাকের চাকাত পিইষা মারছিল।'

'আমি মরলে শহীদ হমু। তবু নেত্রীর ডাক বৃথা যাইতে দিমু না। এরশাদ কাইলকা মিছিল করতে দিব না। আমরা করমুই। স্লোগান দিমু, জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।'

'তুমি জানো আমার প্রবলেম আছে। আমার ভাই প্রেসিডেন্টের রানারের চাকরি করে। অরা যদি জানে আমিই লেইখা দিছি, আমারে তো ধরবই, আমার ভাইয়ের চাকরিটাও যাইব।'

'আরে, কেউ জানব না। আমি কাউরে কমু না তুমি লেইখা দিছ।'

'তুমি জানো আমি বিএনপির সাপোর্টার।'

'তাতে কী। তুমি আর্টিস্ট। তুমি লেখবা। আমি তোমারে টাকা দিমু। তোমারে যখন কেউ সাইনবোর্ড লিখা দিতে কয়, তখন তুমি কি জিগাও আপনে বিএনপি, না আওয়ামী লীগ?'

'না, তা জিগাই না।'

'তাইলে আবার কী? দাও লেইখা। বঙ্গবন্ধু দ্যাশ স্বাধীন করছে। তার মাইয়া শেখ হাসিনা দেশে গণতন্ত্র দিব। দেশ স্বাধীন করতে কত মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ত দিছে। গণতন্ত্রের লাইগা আমরা এতটুকুন করতে পারুম না? এইটা কোনো কথা!'

ইকরাম বলেন, 'তুমি এই গলিতে থাকো। দেখছ, কী রকম বড় বড় ট্রাক যাইতাছে। মাথায় মেশিনগান বসাইছে। ডর লাগে কি না, কও?'

'আমার লাগে না। তুমি রংতুলি আনো গিয়া।'

ইকরাম হোসেন যান তার হ্যাভেন আর্টের দোকানে। একটা সাদা রঙের ডিব্বা আর তুলি নিয়া আসেন।

নূর হোসেন তার লাল রঙের শার্ট খুলে ফেলেন।

ইকরাম হোসেন লিখে ফেললেন তেলরঙে :

স্বৈরাচার নীপাত যাক

গনতন্ত্র মুক্তি পাক।

নভেম্বরের রাত। বেশ ঠান্ডাই পড়েছে। তার মধ্যে খালি গা হয়ে বসে রইলেন নূর হোসেন। যতক্ষণ না বুকের, পিঠের রং শুকায়। তার ঠান্ডা লাগছে না।

ইকরাম হাত দিয়ে একটা অক্ষর স্পর্শ করে বলেন, 'এইবার শুকাইছে। এইবার তুমি তাড়াতাড়ি শার্টটা পইরা নেও। তারপর সাবধানে বাড়ি যাও। রাস্তায় কিন্তু পুলিশ লোকজনরে অ্যারেস্ট করতাছে।'

পুলিশের চোখ এড়িয়ে সাবধানে হাঁটছেন তিনি। বনগ্রামে চলে আসেন নিরাপদেই।

তারপর মহল্লার ছেলেছোকরাদের নির্দেশ দিয়েছেন—আগামীকাল সকাল সকাল চলে আসতে হবে। একসঙ্গে মিছিল করে তারা যাবে গুলিস্তানের দিকে।

বনগ্রামের মোড়ে ছাত্রলীগ-যুবলীগের ছেলেরা একজন একজন করে আসতে থাকে।

তাদের নিয়ে নূর হোসেন এগোতে থাকেন মিছিল নিয়ে।

জয় বাংলা
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
জয় বঙ্গবন্ধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানকার নেতা কাশেম ভাই বলেন, 'এখান থাইকাই মিছিল নিয়া আগানোটা বুদ্ধির কাম হইব না। আমরা পাঁচজন পাঁচজন কইরা গুলিস্তানের দিকে যাই। বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ পার্টি অফিসের সামনে জড়ো হই। সেইখান থাইকা আরও নেতানেত্রীরা আইলে এক লগে বাইরামু। নাইলে এইখানে লড়াই কইরা লাভ নাই।'

ঠিক। নূর হোসেনও এখানে শার্ট খুলবেন না। গুলিস্তানে গিয়া তারপর শার্ট খুলবেন। পৃথিবীকে দেখাবেন বাংলাদেশ কী চায়।

তারা পাঁচজন পাঁচজন করেই এগোতে থাকেন। দ্রুত পায়ে।

বনগ্রাম থেকে নবাবপুর রোড আসতে আসতেই সূর্য উঠে পড়ে।

দোকানপাট এত সকালে খোলে না। রাস্তায় যানবাহন নাই বললেই চলে। একটা-দুটো রিকশা কেবল ইতস্তত চলাচল করছে।

গুলিস্তানের মোড়ে আসেন তাঁরা।

লোকজন আসছে।

পুলিশের ট্রাকও আসছে। বাস আসছে। পুলিশের লোকেরা নামছেন। রাস্তার ধারে দাঁড়াচ্ছেন।

জিরো পয়েন্টের সামনে পুলিশের ব্যারিকেড। কাঁটাতারের বেড়া। জলকামানের গাড়ি।

সকাল আটটা নাগাদ বেশ কিছু লোক জমে যায়।

পুলিশ হ্যান্ডমাইকে ঘোষণা করতে থাকে, '১৪৪ ধারা জারি আছে, পাঁচজনের বেশি কাউকে দেখা গেলেই অ্যারেস্ট করা হবে। আপনারা ভিড় করবেন না। চলে যান।'

লোকজন সরে যেতে থাকে। রাস্তা ফাঁকা হতে আরম্ভ করে।

নয়টার পরে আবার কোত্থেকে কোত্থেকে মানুষ এসে জড়ো হয় গুলিস্তান এলাকায়। বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ মানুষে সয়লাব। স্লোগান ওঠে :

এক দফা এক দাবি
এরশাদ তুই কবে যাবি?

জ্বালো রে জ্বালো
আগুন জ্বালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বৈরাচারের গদিতে
আগুন জ্বালো একসাথে।

এখানে-ওখানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়।

পুলিশ লাঠিচার্জ করে। জনতা ঢিল ছোড়ে।

পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে।

জনতা সেই শেল রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাল্টা ছুড়ে মারে পুলিশেরই দিকে।

সূর্য মাথার ওপরে চলে আসছে। রোদের তেজ বাড়ছে।

নূর হোসেন তার লাল জামা খুলে কোমরে বাঁধেন।

তার বুক আর পিঠের স্লোগান দেখে হর্ষধ্বনি করে ওঠে জনতা।

ওই তো গাড়ি করে চলে এসেছেন শেখ হাসিনা।

নূর হোসেন তাঁর গাড়ির পাশে পাশেই ছুটছেন।

শেখ হাসিনা কাচ নামান। বলেন, 'ওই ছেলেটাকে ডাকো।'

নূর হোসেনের কাছে ছুটে আসেন চার-পাঁচজন, 'ওই চল, আপায় তোরে ডাকে।'

নূর হোসেন যান গাড়ির কাছে।

'আসসালামু আলাইকুম, আপা।'

'ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই, তুমি কী করেছ? পুলিশ তো তোমাকে গুলি করে দেবে?'

'দিলে দিব, আপা। জানের লাইগা ডরাই না। গণতন্ত্র চাই। স্বৈরাচার নিপাত যাক। গণতন্ত্র মুক্তি পাক। জয় বাংলা।'

শেখ হাসিনার চোখ ছলছল করে ওঠে। বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্র কত ভালোবাসে!

শেখ হাসিনাকে মিছিলে পেয়ে মিছিল আত্মহারা হয়ে ওঠে।

চারদিক থেকে মিছিল আসছে।

তারা ছুটে যেতে চাইছে সচিবালয়ের দিকে।

হাজার হাজার মানুষ। এক্ষুনি ছত্রভঙ্গ করা না গেলে তারা ভেঙে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলবে সব ব্যারিকেড। ঢুকে যাবে সচিবালয়ে।

অ্যাকশন।

গুড়ুম গুড়ুম।

'ওইটাকে ওইটাকে...কোমরে লাল শার্ট...বুকে লেখা...স্বৈরাচার নিপাত যাক...'

ঢলে পড়ে নূর হোসেনের রক্তাক্ত দেহ।

গুলি লেগেছে কোমরের নিচে।

রক্ত পিচঢালা পথের ঢাল বেয়ে এগোচ্ছে পিঠের দিকে।

সাদা বার্নিশে লেখা 'গণতন্ত্র' লাল হয়ে গেল রক্তে।

জনতা ঢিল ছুড়ছে। তারা পেছাচ্ছে। তারা এগোচ্ছে।

'অ্যাকশন।'

'ওই বডিটা সরায়ে ফেলো। কুইক।'

পুলিশ তুলে নেয় নূর হোসেনের দেহ। তাদের গাড়িতে।

রাতের বেলা ছেলেরা একে একে ফিরে আসে। বেবিট্যাক্সি নিয়ে ফিরে আসেন ছেলেদের বাবা মজিবুর রহমানও।

তারা হাত-মুখ ধোয়।

নূর হোসেনের মা তাদের ভাত বেড়ে দেন। তারা ভাত খায়। ঘুমোতে যায়।

শুধু নূর হোসেন ফেরেন না।

তার জন্য ভাত বেড়ে রাখেন মা।

ভাত ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন।

গভীর রাত। দুটো কি আড়াইটা।

সমস্ত ঢাকা সুমসাম।

দিনের বেলা ঢাকাবাসী লড়াই করেছে পুলিশের সঙ্গে। মিছিলে গুলি হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে জনতার ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয়েছে। সন্ধ্যা নামতে না-নামতেই ঢাকা পরিণত হয়েছে ভুতুড়ে শহরে।

রাস্তাঘাট ফাঁকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই ফিরে গেছে যার যার আশ্রয়ে।

গ্রেপ্তার করা হয়েছে অনেককেই।

পৌনে আটটার সময় ঢাকাবাসী উৎকর্ণ হয়ে শুনেছে বিবিসির খবর।

তারপর সব নীরব।

এমন সময় ভটভট আওয়াজ তুলে জুরাইন গোরস্থানের গেটে আসে একটা আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের গাড়ি।

সঙ্গে পাঁচটা ট্রাক। পুলিশ আর বিডিআর সদস্যে ভরা। তাদের হাতে হাতে সঙিন।

গোরখোদক আলমগীর আর বাবুলকে ডেকে তোলে তারা।

তিনটা লাশ নামানো হয় আঞ্জুমানের গাড়ি থেকে।

তাদের একজনের পরনে প্যান্ট, গায়ে শার্ট, হাতে ঘড়ি।

একজনের পরনে লুঙ্গি।

একজনের মুখে অল্প অল্প দাড়ি। তার পরনে প্যান্ট। পায়ে কেডস। তার বুকে-পিঠে বাংলায় কী যেন লেখা।

পুলিশ বলে, 'এদের কবর দাও।'

আলমগীর আর বাবুল বলে, 'আগে তো গোসল করাতে হবে।'

'করাও।'

'কাফনের কাপড় আনছেন?'

'আনছি।'

আলমগীর আর বাবুল পড়ার চেষ্টা করে, বুকে-পিঠে কী লেখা! রক্ত এসে মিশে গেছে সেই লেখায়। লোকটার কোমরে গুলি লেগেছিল।

স্বৈরাচার নিপাত যাক

গণতন্ত্র মুক্তি পাক।

গোসল দেওয়ার সময় তারা চেষ্টা করে লেখাটা তুলে ফেলতে। কিন্তু কিছুতেই লেখা উঠছে না।

তারা ডলেই চলেছে সাবান দিয়ে।

পুলিশ বলে, 'দেরি করছ কেন? কুইক।'

আলমগীর বলে, 'লেখা তো ওঠে না।'

'লেখা তুলতে হইব না। ওই রকমেই গোর দেও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবর খোঁড়া হয় তিনটা। তিনটা কবরে শুইয়ে দেওয়া হয় তিনজনকেই।

মাটি দেওয়া হয় মৃতদের ওপরে।

মোনাজাত শেষ হওয়ার আগেই পুলিশেরা ধপধপ শব্দ করে উঠে পড়ে ট্রাকে।

ট্রাক স্টার্ট দেয়।

রাতের নীরবতা ভেঙে চলে যায় ট্রাক আর আঞ্জুমানের গাড়ি।

আলমগীর আর বাবুল কবরের শিথানে খেজুরের পাতা রোপণ করে।

আলমগীর বলে, 'মুর্দার বুক-পিঠ থাইকা লেখাগুলান উঠানো গেল না ক্যান, বল তো!'

বাবুল বলে, 'বার্নিশ দিয়া লেখছে তো। উঠব কেমনে? কেরাসিন তেল নাইলে তারপিন তেল পাইলে উঠান যাইত?'

'তাও উঠত না।'

'ক্যান? উঠত না ক্যান?'

আলমগীর কোনো উত্তর দেয় না।

সে চুপ করলে এক অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে আসে গোরস্থানে।

রাত বাড়ে।

কুয়াশা ঝরে কাঁচা মাটির ওপরে।

শিশির জমতে থাকে কবরস্থানের ঘাসে ঘাসে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত নামে গাবতলীতে।

এত শীত পড়েছে ঢাকা শহরে।

বদরগঞ্জে তাদের বাড়িতে শীত পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। ঢাকা শহরে তো এত শীত পড়ে না।

ভোর পাঁচটার দিকে বাস এসে পৌঁছেছে বাস টার্মিনালে।

নাইট কোচ।

তবে যাত্রীদের কেউই নামল না বাস থেকে। সবাই যার যার আসনে চাদর মুড়ি দিয়ে বা মাফলার ঘাড়ে কানে পেঁচিয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

মাথার ওপরে গাড়ির ছাদে মুরগির খাঁচা।

মুরগির গন্ধে পুরো টার্মিনালেই টেকা দায়।

মোরগগুলো ডাকতে শুরু করে কুক্কুরুকু করে।

ভোর হচ্ছে।

যাত্রীদের নাক ডাকার শব্দও শোনা যাচ্ছে।

শওকত ঘুমোনোর চেষ্টা করে। তার ঘুম আসে না।

তার অকারণেই সোনিয়ার মুখটা মনে পড়ছে।

সোনিয়াকে সে অঙ্ক বোঝানোর চেষ্টা করেছে।

মেয়েটা অঙ্ক বোঝে না।

কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি সাংঘাতিক। লাইনের পর লাইন অঙ্ক মনে রাখতে পারে, এবং হুবহু উগরে দিতে পারে।

সোনিয়ার জোড়া ভ্রু।

তার ডান গালে টোল পড়ে, বাম গালে পড়ে না।

হাসলে মুখটা একটু বাঁকা হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে সাংঘাতিক তার দেহবল্লরি।

এত সুস্বাস্থ্য একটা মেয়ের থাকতে পারে?

ওর শরীরের দিকে নির্লোভ দৃষ্টিতে তাকানো যায় না।

শওকত এই মেয়েটার দিকে তাকাত গোপনে।

তার জিবে জল আসত।

আশ্চর্য তো। মেয়েটা অঙ্ক পারে না। তাই তেমন সম্মানের চোখে তাকে সে দেখে না। তাহলে তাকে সে কামনা করে কীভাবে?

শওকত হিসাব মেলাতে পারে না।

সে তার নিজের ভেতরের লোভী পুরুষটাকে শাসন করে। এটা ঠিক নয়, শওকত। তুমি আদর্শ পিতার আদর্শ ছেলে। তুমি এমন কিছু কোরো না, যা তুমি মানুষকে বলে বেড়াতে পারবে না।

এখন গাবতলীতে *আবে হায়াত* সিনেমার পোস্টারের নিচে সনি সিনেমা লেখা দেখে তার সোনিয়াকে মনে পড়ে যাচ্ছে।

সে অঞ্জু ঘোষের দেহসম্পদের দিকে তাকায়।

ভোরের আলোয় অঞ্জু ঘোষ যেন তাকে বিদ্রূপ করছে। বলছে, তুমি একটা ভণ্ড, শওকত। তুমি একটা ভণ্ড। ভালো মানুষের মুখোশের আড়ালে তুমি একটা পশু।

চারদিকে আলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। লোকজন চলাচল শুরু করেছে।

গাবতলীও হয়ে উঠতে শুরু করেছে জমজমাট।

ব্যাগ হাতে শওকতও নেমে পড়ে বাস থেকে।

এগিয়ে গিয়ে রাস্তা পেরোয় শওকত। একটা রেস্টুরেন্টে বসে। রেস্টুরেন্টের নাম ক্ষণিকালয়। সাইনবোর্ডে জ্যান্ত মোরগ, ছাগল আর মাছের ছবি আঁকা। তাকে এখানে নাশতা করতে হবে। তারপর সে ফুলবাড়িয়ার বাস ধরবে। বাস পলাশী হয়ে যাবে।

রেস্টুরেন্টের বেসিনে সে মুখ ধোয়।

আয়নায় নিজের চেহারা দেখে।

ভয়াবহ দেখাচ্ছে চেহারাটা।

চা খেতে হবে।

চায়ের সূত্র ধরে আবার মনে পড়ে সোনিয়ার কথা। মেয়েটি তাকে চা বানিয়ে খাইয়েছিল। তার চায়ে সর ভাসছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার সেই পুরোনো নাশতা। পরোটা ডাল ডিম। তেলে ভাজা পরোটা আসা মাত্র নিউজপ্রিন্ট চেয়ে নেওয়া। পরোটার তেল মুছে ফেলা খবরের কাগজের টুকরায়।

নাশতা করে চা।

চা মানেই সোনিয়া। উফ্।

সোনিয়া মেয়েটা কি তাকে এইভাবে তাড়িয়ে মারবে!

মিনিবাস চলছে। ড্রাইভারের পেছনের সিটে বসেছে শওকত। ট্রাভেল ব্যাগটা ইঞ্জিন কভারের কাছে রাখা।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে।

আবার সে ফিরে এল ঢাকা শহরে।

প্রতিবার যখন সে ফেরে ঢাকায়, কেমন যেন অনাথ অনাথ লাগে নিজেকে। অনেক বছরই তো হলো, এরশাদ সাহেবের কল্যাণে, চার বছরের কোর্স পড়ছে পাঁচ বছর ধরে, তবু তো শহরটা তার কাছে পুরোনো হচ্ছে না।

বাসের জানালা দিয়ে সে ঢাকা শহর দেখছে।

গাবতলী থেকে বাস এগোতে থাকে দক্ষিণ দিকে। এই হলো টেকনিক্যাল মোড়। ওই বাঁ পাশে বিআরটিসির ডিপো।

রাস্তার ধারে দেয়ালে একটা পোস্টার।

এক যুবকের পিঠে লেখা 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক'।

তার বুকে লেখা 'স্বৈরাচার নিপাত যাক।'

বিবিসিতে সে শুনেছে, নূর হোসেন নামের একজন ১০ নভেম্বর বুকে-পিঠে এই স্লোগান লিখে রাজপথে মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন।

পুলিশের গুলিতে তিনি নিহত হয়েছেন।

তাঁর ফটো দিয়ে পোস্টার ছাপা হয়ে গেছে। কে তাঁর ছবি তুলল?

বাস এগোচ্ছে। বেশ বাতাস আসছে খোলা জানালা দিয়ে।

কল্যাণপুর থেকে শ্যামলী।

শ্যামলী সিনেমা হলে অঞ্জু ঘোষের বড় ছবি।

অঞ্জু ঘোষ। সোনিয়া। সোনিয়া মেয়েটার কথা তার এত মনে হচ্ছে কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ হাসিনা আর খালেদা জিয়াকে গৃহবন্দী করা হয়েছে ১১ নভেম্বরেই।

বিবিসির সাংবাদিক আতাউস সামাদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে তারপর।

বিরোধী দলগুলো আর হরতাল ডাকতে পারে না। তারা 'কর্মসূচি' দেয়, বিবিসিতে সেই খবর প্রচারিত হলে সারা দেশে হরতাল পালিত হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

প্রায় প্রতিদিনই হরতাল থাকে।

শওকতের ঢাকা আসা খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল।

প্রধান কারণ তার টিউশনি।

তাই সে চলে এসেছে।

তাদের বিশ্ববিদ্যালয় এখনো বন্ধ।

তাদের হল এখনো খালি।

কিন্তু এর মধ্যেই হলে উঠে পড়বে সে।

তার যাবার আর তো কোনো জায়গা নেই।

বাস কলেজ গেট পেরোল। তারপর আসাদ গেট।

সোবহানবাগ।

শুক্রাবাদ।

কলাবাগান।

সায়েন্স ল্যাবরেটরি।

নিউ মার্কেট।

নিউ মার্কেটে কত দিন আসা হয় না!

বাসের হেলপার বাসে থাপড় মারছে, আর চিৎকার করছে, আজিমপুর, পলাশী, চানখাঁরপুল, ফুলবাড়িয়া, গুলিস্তান।

বাসের হেলপারের এই বাড়ি মারা দেখে শওকতের মনে পড়ে *উন্মাদ*-এর একটা কার্টুন।

ছেলে ছোটবেলায় খুব ভালো তবলা বাজায়। বাবা বললেন, ছেলে আমার বড় হয়ে কত বড় তবলাবাদকই না হবে।

দেখা গেল, সেই ছেলে বড় হয়ে হয়েছে মিনিবাসের হেলপার। বাসের গায়ে বাড়ি মারে, চিৎকার মারে—ডাইরেক্ট গুলিস্তান, ডাইরেক্ট গুলিস্তান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেকটা ছেলে ছোটবেলায় গিটার বাজায়। বাবা-মা ভাবলেন, ছেলে বড় হয়ে হবে অনেক বড় ওস্তাদ। গুণী শিল্পী। বড় হয়ে সে হলো কিনা একজন ধুনকার, লেপ-তোশকের তুলা ধুন করে।

ধুন থেকে শওকতের মনে পড়ে গেল *উন্মাদ*-এর আরেকটা কার্টুন।

একটা ছাত্রী হলের সামনে দাঁড়িয়ে একটা বখাটেকে বলছে, 'এত তুলা কে ধুনিবে?'

বাস এসে পড়ে আজিমপুর।

পরের স্টপেজই হলো পলাশী। সে পলাশীর মোড়েই নেমে যেতে পারে, তবে একেবারে বুয়েটের শহীদ মিনারের সামনেও বাস থামাতে পারে। পলাশীর মোড়েই নামার সিদ্ধান্ত নেয় সে। হলের গেটে গিয়ে দেখতে হবে, ভেতরে ঢোকার মতো পরিস্থিতি আছে কি না। একটু দূরে নেমে ধীরে ধীরে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

ফাঁকা হলের গেটে এসে হাজির হয় সে।

দারোয়ানকে প্রথমেই বের করে দেয় ৫০টা টাকা। বলে, 'ইদ্রিস ভাই, ধরেন। দেশ থেকে আপনার জন্য গিফট আনতে পারি নাই, তাই দিলাম।'

দারোয়ান 'না স্যার, লাগব না, স্যার' বলে টাকাটা গ্রহণ করে।

শওকত একা একা শূন্য করিডর দিয়ে হাঁটছে। হেঁটে হেঁটে ওঠে সিঁড়িতে।

সব দরজা বন্ধ। জানালা বন্ধ।

সে দোতলায় ওঠে। নিজের পায়ের শব্দ নিজেই পাচ্ছে।

চাবি দিয়ে দরজা খোলে।

ভেতরে এক রাশ ধুলা পড়ে আছে।

যাওয়ার আগে বিছানা থেকে চাদর তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

বাড়ি থেকে ধুয়ে এনেছে।

সে লাইট জ্বালিয়ে চাদর বিছায়।

বাথরুম সেরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে।

কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই সে দেখতে পায় সোনিয়ার মুখ। কী যন্ত্রণা! কী যন্ত্রণা!

সে দেখতে পায় সোনিয়ার বুকের জ্যোৎস্না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকসুদার রাহমান চলে এসেছে ঢাকায়। হল বন্ধ। মাঝেমধ্যেই গোয়েন্দা পুলিশ উঁকি দেয় হলগুলোতে। কোথাও কোনো সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্র হচ্ছে কি না। তাই হলে ওঠা বিপজ্জনক। আর তিতুমীর হলটা একেবারেই রাস্তার ওপরে।

মাকসুদার রাহমান তাই উঠেছে নয়াপল্টনের ভেতরে একটা বন্ধুর মেসে।

প্রতিটি রুমে দুটো করে বিছানা।

মাকসুদার ফকিরাপুল থেকে একটা চকি কিনে আনে। ৩০০ টাকা দাম নেয় চকিটার। ৩০০ টাকাও তার কাছে অনেক টাকা।

হলে গিয়ে নিয়ে আসে তোশক, চাদর, বালিশ, লেপ-কাঁথা। আর নিয়ে আসে তার বইগুলো।

তিতুমীর হলে তার টেবিলে ইঞ্জিনিয়ারিং বই নয়, শোভা পায় অনেক কবিতার বই, সাহিত্য আর দর্শনের বই, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, নির্মলেন্দু গুণ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুনীল, শক্তি, শঙ্খ, শার্ল বোদলেয়ারের অনুবাদ বা *কবিতার ক্লাস*। বই ছাড়া সে চলতে পারে না। তাই হল থেকে বিছানা-বালিশ আনার সময় সে নিয়ে আসে তার প্রিয় কতগুলো বই। বারবার পড়তে হয় যেসব।

নয়াপল্টনের একটা দোতলা বাসার নিচতলায় চারটা রুম নিয়ে তাদের মেসবাড়ি। দোতলায় বাসাওয়ালা থাকেন।

নিচতলায় তারা থাকে আটজন।

বাকি সাতজনই চাকরি করে।

শুধু মাকসুদার ছাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ছেলে, নাম মফিজ, তাদের রান্নাবাড়া করে দেয়।

তার বয়স ১৮-১৯ হবে। হ্যাংলা-পাতলা।

একদিন দেখা গেল, মতিঝিলের সওদাগরি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি আয়ুব সাহেব মফিজের গল্প করছে সবাইকে, রসিয়ে রসিয়ে।

কী হয়েছে?

মফিজ যখন ঘর মুছছিল, তখন তার লুঙ্গি থেকে টপটপ করে পড়ছিল তরল। তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ডাক্তার তাকে জিগ্যেস করে, 'কী করেছ?'

'কিছু না।'

ডাক্তার তাকে মারে এক চড়।

তখন মফিজ বলে, ছাইবিক্রেতা মহিলাকে ঘরে এনেছিল, যখন কেউ ছিল না বাসায়।

ডাক্তার বলেন, ওর গনোরিয়া হয়েছে। তিনি তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছেন।

ভয়াবহ ব্যাপার। মাকসুদার জুতা পায়ে ঘরে চলতেও অস্বস্তি বোধ করে। সে যেতে শুরু করে সাপ্তাহিক *দেশবন্ধু* পত্রিকা অফিসে। মোজাম্মেল বাবু, বুয়েট থেকে সদ্য বেরিয়েছেন পাস করে, এই পত্রিকার সম্পাদক। শিল্পী ইউসুফ হাসান পত্রিকার শিল্প-সম্পাদক। জাতীয় কবিতা পরিষদের তরুণতম কবি তারিক সুজাতও আছে এর সঙ্গে। আছে তরুণ কবি লুৎফুল হোসেন।

লুৎফুল হোসেন দেখতে গ্রিক ভাস্কর্যের মতো। হালকা-পাতলা, মাঝারি উচ্চতা, ফরসা, কাটা কাটা নাক, চিবুক।

লুৎফুল হোসেন ছিল ভীষণ চটপটে আর ভীষণ কাজপাগল। একদিন মোটরসাইকেলের পেছনে বসে ছিল সে, সামনে চালাচ্ছিল তার বন্ধু, একটা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল, চালক অক্ষত রইল, কিন্তু লুৎফুলের এক পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল ট্রাক।

চিকিৎসা শেষে লুৎফুল এখন চলে ক্রাচ দিয়ে।

দেশবন্ধু পত্রিকা অফিসে তারা দিনরাত থাকে।

এরশাদের বিরুদ্ধে একের পর এক লেখা আর কার্টুন ছাপা হচ্ছে।

প্রচ্ছদ আঁকছেন শিশির ভট্টাচার্য্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিউ মার্কেটের দেয়ালে কে যেন লিখে রেখেছে, 'চিড়িয়াখানায় গাধা নাই, এরশাদ আছে চিন্তা নাই।'

মাকসুদার রাহমান *দেশবন্ধু* অফিসে বসে লিখে ফেলে একটা ছড়া।

স্টেডিয়ামের দোতলায় *দেশবন্ধু* অফিস। জানালা দিয়ে ভেতরের খেলাও দেখা যায়। একদিন ভেতরে গিয়ে তারা মোহামেডানের খেলাও দেখে ফেলে।

অফিসের ভেতরে আবার কাঠের দোতলা। নিচতলায় মোজাম্মেল বাবুর চেম্বার। ওপরতলায় *দেশবন্ধুর* কর্মীরা বসে। একই সঙ্গে এটা একটা অ্যাডভার্টাইজিং ফার্মও—শৈলী।

দোতলায় বসেই পাশাপাশি লুৎফুল আর মাকসুদার লিখছে।

লুৎফুল লিখল ক্রাচ নিয়ে একটা কবিতা।

তারিক সুজাতও লিখে ফেলল একটা কবিতা, লুৎফুলকে ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে দেখেই—ক্রাচ এবং আমি।

আর মাকসুদার লিখে ফেলেছে ছড়া :

শহরজুড়ে রব উঠেছে চিড়িয়াখানায় গাধা নাই
একটামাত্র গাধা দেশের স্টেনিতে আর বাঁধা নাই।

AMARBOI.COM

শিশির ভট্টাচার্য্য থাকেন কাঁঠালবাগান বাজারের ভেতরে এক গলিতে, সেখানে বসে তিনি কার্টুন আঁকেন, মাঝেমধ্যে চলে আসেন *দেশবন্ধু* অফিসেও। সেখানে বসেই তিনি এঁকে ফেলেন *দেশবন্ধুর* প্রচ্ছদের কার্টুন, একটা গাধা, কিন্তু দেখতে ঠিক এরশাদের মতো।

দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে।

কথা বলা মুশকিল।

শামসুর রাহমানের বাসায় যাওয়া হয় মোজাম্মেল বাবুর ইয়েলো অকার গাড়িতে চড়ে। সেই গাড়ির দুই দরজা। পেছনের সিটে বসতে হলে সামনের সিট সামনের দিকে কাত করতে হয়।

তিনি *দেশবন্ধু* পত্রিকায় কলাম লেখেন।

কলাম লেখেন হুমায়ুন আজাদও।

একদিন শামসুর রাহমান ধরিয়ে দেন তার একটা কবিতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একজন শহীদের মা বলছেন'।

শামসুর রাহমানের সেই গোটা গোটা গোল গোল অক্ষর। আহা, মনে হচ্ছে, নক্ষত্রের আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে সেই অক্ষর থেকে।

মাকসুদার রাহমান হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সেই কাগজের দিকে। সে বলে, 'বাবু ভাই, আমি এই কবিতাটা আমার কাছে রেখে দিতে চাই।'

বাবু ভাই বলেন, 'কবিতাটা ফটোকপি করে দিচ্ছি। তুই এক কপি রাখ।'

কবিতাটা *দেশবন্ধু* পত্রিকায় ছাপা হয় :

যাকে দশ মাস দশ দিন পেটে ধরেছি, এখন
সে কোথায়? পুড়িয়ে আমার বুক এই
পোড়া দেশটিকে ভালোবেসে,
ভালোবেসে শাপলা-শালুক, খালবিল, মাছরাঙা
সোমত্ত নদীর বাঁক, দোয়েলের শিস,
দিগন্ত সবুজ করা টিয়েদের ঝাঁক,
যৌবনের প্রফুল্ল সকালে
ঝরে গ্যাছে।
...
যে তন্বীকে সে ভাবত সে স্বপ্নের একান্ত সহচরী,
তার দুটি হাতে মেহেদির ছোপ লাগার আগেই
একটি শিকারি বাজ ওকে
করেছে হনন,
কেননা সে চেয়েছিল গণতন্ত্র মুক্তি পাক লিখে
বুকে, স্বৈরাচারী শাসকের পতন ঘোষণা করে
হেঁটে যাবে রাজপথে...

AMARBOI.COM

দেশবন্ধু পত্রিকায় আগুন ঝরছে। নভেম্বরের শুরুতে বেরিয়েছে প্রথম সংখ্যা। হেডলাইন ছিল : ডেটলাইন ১০ নভেম্বর।

১০ নভেম্বরে সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে নূর হোসেনদের মিছিল পত্রিকাটিকে করে তোলে সাহসী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামসুর রাহমানের কলামে আগুন, হুমায়ুন আজাদের কলামে বারুদ।

শামসুর রাহমান তখন *দৈনিক বাংলা* ও *বিচিত্রা*র প্রধান সম্পাদক।

তিনি পদত্যাগপত্র রচনা করেন, সেটার কপি পাঠিয়ে দেন *দেশবন্ধু* পত্রিকায়। স্বৈরাচারী সরকারের একের পর এক অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করছেন *দৈনিক বাংলা* ও *বিচিত্রা* থেকে। সেই প্রতিবাদপত্র ছাপা হয় *দেশবন্ধু*তে।

প্রতিদিনই হরতাল থাকে।

প্রতিদিনই পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ বাধে।

এরশাদ জরুরি অবস্থা জারি করেন। সভা-সমাবেশ, হরতাল-অবরোধ নিষিদ্ধ।

সন্ধ্যায় তিনি ভাষণ দেন রেডিও-টিভিতে। যাকে বলা হয়ে থাকে জাতির উদ্দেশে প্রেসিডেন্টের ভাষণ।

তিনি সমস্যার সমাধান খুঁজতে আলোচনার আহ্বান জানান।

বিরোধী দল ৭২ ঘণ্টার হরতাল ডাকে। পত্রিকায় ছাপা হয়, ৭২ ঘণ্টার কর্মসূচি ডাকা হয়েছে। হরতাল কথাটা বলা যাবে না।

তবে সবাই খবর পেয়ে যায় বিবিসির মাধ্যমে। এ জন্যই গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিবিসির সাংবাদিক আতাউস সামাদকে। বাংলাদেশ টেলিভিশনকে বলা হয়—সাহেব বিবি গোলামের বাক্স।

কঠোর সেন্সরশিপ। *দেশবন্ধু* পত্রিকা এবার কী করবে!

তারা প্রচ্ছদে ছাপে : জাতির উদ্দেশে স্বৈরজান্তা।

ভেতরে ছেপে দেয় ইয়াহিয়া খানের ভাষণ। সূত্র : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত দলিলপত্র, মুক্তিযুদ্ধ।

সাপ্তাহিক *দেশবন্ধু*র ১০ম সংখ্যা বাজারে দেওয়া হবে। নববর্ষ ১৯৮৮ সংখ্যা। শিরোনাম— 'রক্তের পথ ধরে ৮৭ গড়িয়ে আটাশি।'

ডিসেম্বরের শেষের দিনগুলোতে জরুরি অবস্থা উপেক্ষা করে দেশব্যাপী হরতাল চলছেই।

এর মধ্যে দেশে ঘরোয়া রাজনীতি চালু হয়েছে। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকেও অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বিবিসির কার্যক্রম বাংলাদেশে নিষিদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশির ভট্টাচার্য্য একটা কার্টুন এঁকেছেন। এরশাদকে বানানো হয়েছে এক জন্তু। তার হাতের জায়গায় নখরযুক্ত থাবা। এই কার্টুন ছাপা হলে পত্রিকা যে নিষিদ্ধ হবে, সেটা সবাই জানে।

বাজারে যাওয়ার আগেই মোজাম্মেল বাবু সবাইকে ডেকে বলেন, 'আজকে রাতে আমরা পত্রিকা বাজারে দেব। কালকে অফিসে কারও আসার দরকার নাই। কালকের দিনটা দেখি। তারপর আমরা বুঝব আমাদের কী করতে হবে।'

পরের দিন বাজারে যায় পত্রিকা।

মাকসুদার আর তার পল্টনের মেসবাড়ি থেকে বেরোয় না।

তারও পরের দিন সরকার প্রেসনোট জারি করে, সাপ্তাহিক *দেশবন্ধু* পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মাকসুদার কী করবে বুঝছে না।

ঘরে বসে সে একটা কবিতা লিখে ফেলে নূর হোসেনকে নিয়ে। দীর্ঘ কবিতা।

কবি শামসুর রাহমানও একটা কবিতা লেখেন। শিরোনাম : সাপ্তাহিক দেশবন্ধু নিষিদ্ধ হওয়ার পরে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকতের জীবনে এর আগে এই রকম অনুভূতি হয়নি। এ জীবনে অনেক ছাত্রীকে সে পড়িয়েছে। ছাত্রীদের মায়েদের সঙ্গেও তার কথাবার্তা কমবেশি হয়েছে। ইউনিভার্সিটিতেও তো বেশ কিছুসংখ্যক তরুণীর সঙ্গে তার কমবেশি মোলাকাত হয়েছে। তাদের গ্রামেও দু-চারটা মেয়ে আছে, যাদের দিকে তাকানো যায়। কিন্তু সোনিয়া কোত্থেকে উড়ে এসে তার সমস্ত চিন্তা-চেতনা জুড়ে বসে পড়ল? আশ্চর্য ঘটনা তো!

তার একটা সময় মনে হতে থাকে, সোনিয়া তার জন্য অপেক্ষা করছে, তার কথা ভাবছে এবং ব্যথা পাচ্ছে। সোনিয়া ব্যথা পাচ্ছে মনে করে শওকত ব্যথা পেতে শুরু করে দিল। সোনিয়া আদৌ ব্যথা পাচ্ছে কি না কে জানে, পেলেই বা তাতে শওকতের কী!

সোনিয়া তার কাছে স্থিতিবিদ্যা বুঝতে এসেছিল। নিয়মিত টিউশনি করে বলে এই সমস্ত বিষয়, তার প্রতিটা চ্যাপ্টার, প্রতি চ্যাপ্টারের থিয়োরি আর প্রবলেম, সম্পাদ্য-উপপাদ্য, ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, শওকতের নখদর্পণে।

কিন্তু নারীর হৃদয়বৃত্তান্ত শওকতের নখদর্পণে নয়।

একদিন সোনিয়াকে সে মোমেন্ট বোঝাচ্ছে, বাংলায় সেটা ভ্রামক, ভর গুণন বাহু, বলতেই সোনিয়া বলে, 'ভাইজান, বাহু মানে না হাত?'

শওকত বলে, 'এই বাহু সেই বাহু নয়।'

'ভাইজান, আপনার হাতের কোন অংশটা বাহু।'

'দেখো, আমরা বায়োলজি পড়তে বসি নাই। আমরা স্ট্যাটিকস পড়তে বসছি।

'ভাইজান, বাহুডোর কথাটার মানে কী?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত বলে, 'পড়ায় মন দাও, সোনিয়া।'

'ভাইজান, আমি তো একটা জিনিস জানতে চাইতেছি। আপনার জানা থাকলে বলেন, তা না হলে বলবেন না।'

'না, জানা নাই।'

'ও আচ্ছা। আমি ভাবছিলাম, ডোর মানে দরজা।'

'ডোর মানে দরজা, ঠিক আছে। সেটা ইংরাজিতে। এটা তো বাংলা।'

'বাংলা ডোর মানে কী?'

'বললাম তো, জানি না।'

'ভাইজান, আপনার পায়ের সাথে আমার পা লাগছে। সালাম করি।'

বলে সোনিয়া উবু হয়ে পায়ে হাত দিতে যায়।

ঝুঁকে পড়ায় তার জামার বুক নিচে নেমে যায় খানিকটা। তাতেই আসল সর্বনাশটা ঘটে যায়।

শওকত এখন বুয়েটের নজরুল ইসলাম হলের ২১১ নম্বর রুমের বিছানায় শুয়ে সেটা বেশ বুঝতে পারছে। সোনিয়ার বক্ষ-সৌন্দর্য ভয়াবহ এবং তারই আঘাতে শওকত এখন শয্যাশায়ী।

কিন্তু এই আকর্ষণ তো শারীরিক আকর্ষণ।

দেয়ালে স্থির হয়ে থাকা একটা টিকটিকির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শওকত নিজেকে প্রশ্ন করে, শারীরিক আকর্ষণকে কি প্রেম বলে? এ তো কিছুতেই প্রেম নয়।

তাহলে এই বা কী? তাহলে সারাক্ষণ এই মেয়েটির চিন্তাতেই সে মগ্ন কেন?

বিকাল হয়ে এসেছে। দুপুরবেলার খাবার খেয়ে অভ্যাসবশতই শওকত শুয়ে ছিল। তার ঘুম আসছে না।

এমন সময় দরজার কাছে শব্দ হয় সামান্য। শওকত ওঠে। দেখে, দরজার নিচ দিয়ে একটা হলুদ খাম ঢুকে গেছে।

চিঠি এসেছে।

শওকত এগিয়ে যায়। দেখে, তার নামই লেখা। কিন্তু হাতের লেখা মার নয়।

সে চিঠিঠা খোলে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইজান,

চাচি আম্মার অনুরোধে আমি এই চিঠি লিখলাম। হরতাল-অবরোধের মধ্যে আপনি ঢাকা গেছেন। চাচি আম্মা আপনার চিন্তায় আকুল। আপনি কি ঠিকভাবে পৌঁছেছেন?

আপনি চাচি আম্মাকে চিঠি লিখে জানাবেন।

তবে শুধু চাচি আম্মা নয়, আরও একজন আপনার কথা সারাক্ষণ ভাবে, এটাও জানবেন। আপনি যদি চাচি আম্মার কথা ভেবে চিঠি না-ও লেখেন, আরেকজনের কথা ভেবে অবশ্যই লিখবেন।

চাচি আম্মার ঠিকানায় আপনি তাকেও চিঠি লিখতে পারেন। শুধু খামের ওপরে তার নাম লিখবেন।

এখানকার সব খবর ভালো। আমাদের কলেজ বন্ধই থাকে। আর খুলবে-টুলবে বলে মনে হয় না। টেস্ট পরীক্ষাও হবে-টবে না। আপনি শুধু শুধু কষ্ট করে স্থিতিবিদ্যা শেখালেন।

শোনেন, বাহুড়োর কথাটার মানে হলো... থাক। আপনাকে বলে কোনো লাভ নাই।

তবে বহু জিনিস আছে, থিয়োরি পড়লে হয় না। প্র্যাকটিক্যালও করতে হয়।

ইতি আপনারই...

AMARBOI.COM

চিঠিটা দুবার পড়ে শওকত। পড়ে অজান্তেই চিঠিতে সে চুমু খায়। তার মনে হতে থাকে, এই চিঠিতে সোনিয়ার হাতের স্পর্শ লেগে আছে। চিঠিটার উত্তর তাকে লিখতে হবে। সে কী লিখবে?

সে মনে মনে চিঠির জবাব মুসাবিদা করে। সোনিয়া, আমি সারাক্ষণ তোমার কথাই ভাবছি। তুমি তো আমার হৃদয়-মন হরণ করে নিয়েছ।

ঠিক তখনই দেয়ালবিহারী টিকটিকি টিক টিক করে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার কবিতা উৎসব হচ্ছে। মাকসুদার রাহমান তার একজন সক্রিয় কর্মী। ফয়েজ আহমদ, বিখ্যাত সাংবাদিক ও ছড়াকার, রাজনৈতিক কর্মীও, *মধ্যরাতের অশ্বারোহী* গ্রন্থের লেখক, টাক মাথা, বেঁটেখাটো, শ্যামবর্ণের মানুষটির চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, কবিতা উৎসবের আহ্বায়ক। তিনি মাকসুদারকে ডাকেন মোকসেদ বলে। বলেন, 'মোকসেদ, শোনো, তুমি একটা চিঠি লেখো। আমি বলছি। কীভাবে লিখতে হবে। রবিউল হুসাইনকে নিয়ে যাব চাঁদা তুলতে।' মাকসুদার কবিতা উৎসবের প্যাডে চিঠি লেখে।

হুমায়ুন আজাদও তাকে পছন্দ করেন। কবিতা উৎসবের বুলেটিনের লেখা মাকসুদার একাই লিখে ফেলে। হুমায়ুন আজাদ সেই লেখা দেখে বলেন, 'তোমার একটা বানানও ভুল হয়নি। শুধু নিরন্ন বানানটা একটু অভিধানে দেখতে হবে। এটা আবার মূর্ধন্য ণ হবে না তো!' তিনি অভিধান দেখে বলেন, 'মাকসুদার রাহমান, তুমিই ঠিক।'

হুমায়ুন আজাদ একটা কবিতা লিখেছেন, 'গরিবেরা সাধারণত সুন্দর হয় না, তাদের ঘরবাড়ি খুব নোংরা... মেয়েদের স্তন খুব বিখ্যাত, কিন্তু গরিব মেয়েদের স্তন শুকিয়ে শুকিয়ে বুকের দুপাশে দুটো ফোড়ার মতো দেখায়...কেবল যখন তারা প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে, তখন তাদের সুন্দর দেখায়।' এই কবিতাটা বিভিন্ন আসরে তিনি পড়ে শোনান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এই অধ্যাপক সারাক্ষণ একটা জিনসের প্যান্ট পরে থাকেন, ওপরে পরেন টি-শার্ট, তবে শীতের দিনে তার ওপরে পরে নেন একটা জ্যাকেট। তিনি হালকা-পাতলা, তাঁরও চোখে ভারী চশমা। তিনি কথা বলেন আলতো স্বরে, একটাও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে, ম্যাচের বদলে তিনি বলেন দিয়াশলাই। তিনি 'র'-এর উচ্চারণ করেন না, তাঁর মতে, এই 'র' এত পাতলা যে এর উচ্চারণ য়-এর মতো, তাই গরিবেরা সাধারণত সুন্দর হয় না হুমায়ুন আজাদের কণ্ঠে শোনায় এই রকম—গয়িবেয়া সাধায়ণত সুন্দ—হয় না।

হুমায়ুন আজাদও আসেন টিএসসিতে। দোতলায় কবিতা উৎসবের কার্যালয়ে। তাঁরা কাজ করেন, আড্ডা দেন। চা খান। সন্ধ্যার পর যখন তিনি তাঁর আজিমপুরের বাসায় ফিরবেন, একদিন মাকসুদারকে ডেকে নেন তাঁর রিকশায়।

হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে এক রিকশায় উঠে মাকসুদার নিজেকে ধন্য বলে মনে করে। হুমায়ুন আজাদ অবশ্য রিকশার বাম দিকে বসেন। এবং তিনি সারাক্ষণ রিকশাওয়ালাকে ভয়ার্ত স্বরে নির্দেশ দিতে থাকেন, 'এই রিকশাওয়ালা, বাম দিকে, এই রিকশাওয়ালা সাবধান, দেখো, বাস আসছে, এই রিকশাওয়ালা করছ কী, করছ কী!' যিনি কথাবার্তায় এই রকম সাহসী, তিনি যে পথ চলার ব্যাপারে এই রকম ভীতু, তা দেখে মাকসুদারের আশ্চর্য লাগে।

পলাশীর মোড়ে এসেও মাকসুদার নেমে যায় না। বলে, 'স্যার, আপনাকে আপনার বাসায় নামিয়ে দিয়ে তারপর আসব।' হুমায়ুন আজাদ তাতে খুশিই হন।

কবি মহাদেব সাহাও আসেন টিএসসিতে। তাঁর সাদা-কালো লম্বা চুল। গায়ে পাঞ্জাবি, চাদর, আর পরনে প্যান্ট। তাঁর চোখেও চশমা। তিনি কথা বলেন সুন্দর একটা সুর তুলে। তিনি গল্প করেন, মাকসুদ হাঁ করে শোনে। বলে, 'একবার ২৬ মার্চে *ইত্তেফাক*-এ আমাকে এডিটরিয়াল লিখতে বলল কাঁচা পায়খানা সমস্যা নিয়ে। আমি বললাম, ওই লেখাটি লিখতে পারব না, ওই কম্মটি করে দিতে পারব।' তাঁর মতো সুভাষিত মানুষও যে এই কথা বলতে পারেন, তা দেখে মাকসুদার বিস্মিত বোধ করে।

মাকসুদারের নিজের কবিতা লেখাও চলছে। মিলে গেছে কবিদের সঙ্গে মেলামেশা করবারও সুযোগ। বুয়েটের পড়াশোনা তার লাটে উঠেছে। সে কবিতার নেশাতেই অস্থির।

টিএসসির মোড়ে গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। প্রায়ই হরতাল থাকে, অবরোধ থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সব নিয়ে একটা ছড়াও লিখে ফেলল সে।

শহরজুড়ে রাত্রি আসে নিয়নে
চাঁদের চিঠি ভুল ঘরে দেয় পিয়নে
নিঝুম সড়ক কারফিউ দেয় পাহারা
শহরটা কি মরুভূমি সাহারা

দ্বিতীয় জাতীয় কবিতা উৎসবের আসর বসেছে। যথারীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কবিতা। মাত্র কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে পুলিশের গুলিতে অনেক হতাহত হয়েছে। নয়জনের মৃত্যুর কথা সংবাদমাধ্যমে লেখা হলেও লোকমুখে শোনা যাচ্ছে কুড়িজনের মৃত্যুর কথা।

সরকার আবার নির্বাচনের আয়োজন করতে যাচ্ছে। ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ চলছে। আ স ম আবদুর রব নির্বাচনে অংশ নেবেন।

লুৎফর রহমার রিটন তাঁর ছড়াটাকে হালনাগাদ করেছেন—

আবদুল হাই
করে খাই খাই
এক্ষুনি খেয়ে বলে কিছু খায় নাই
খায় সে সব খায়
আ স ম রব খায়।

দোসরা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮। দ্বিতীয় রাতেও কবিতা উৎসবের সামনে হাজার হাজার মানুষ। কবিতা শুনতে এসেছে মানুষ, এসেছে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে।

সন্ধ্যা পেরিয়ে যাচ্ছে। এই আসরের সভাপতি শিল্পী কামরুল হাসান। তিনি যখন দর্শকসারিতে বসে আছেন, তখন কবি রবীন্দ্র গোপ তাঁর ডায়েরিটা তুলে দেন শিল্পীর হাতে। কামরুল হাসান একটা স্কেচ করেন। তাতে একটা শেয়াল, সাপ আর একটা বিকটদর্শন মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভাপতিত্ব করার জন্য তাঁকে মঞ্চে তোলা হয়। কামরুল হাসান তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'দেশ আজ বিশ্ববেহায়ার খপ্পরে।'

তারপর বলেন—

প্রতিকার আছে জানা,
মাথার ওপরে সুপুরি রাখিয়া
কাষ্ঠপাদুকা হানা।

ভাষণ দিয়ে তিনি মঞ্চে বসে থাকেন। কবিরা একটার পর একটা কবিতা পড়ে চলেছেন।

এই সময় হঠাৎই কামরুল হাসান ঢলে পড়েন মঞ্চের মাঝখানেই। তাঁকে দ্রুত নেওয়া হয় পিজি হাসপাতালে। ততক্ষণে তিনি আর বেঁচে নাই।

কবিরা আর শিল্পীরা মিলে পরদিন তাঁকে সমাহিত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই, কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি চত্বরে।

কামরুল হাসানের শেষ স্কেচটা, আর তাঁর বাণী 'দেশ আজ বিশ্ববেহায়ার খপ্পরে' পরের দিন দৈনিক *সংবাদ*-এ প্রকাশিত হয়, সেটা এক রাতেই পোস্টার করে ছাপতে ছুটে যায় তারিক সুজাত, ইউসুফ হাসান, আসলাম সানী, মোহন রায়হান প্রমুখ। মাকসুদার রাহমানও থাকে তাঁদের সঙ্গে, সারা রাত, মোহন রায়হানের বিকল্প প্রেসে, পুরান ঢাকায়। পরের দিন কামরুল হাসানের শেষকৃত্যের আয়োজনে সমবেত হাজার হাজার মানুষের হাতে সেই পোস্টার বিলি করে দেওয়া হয়।

নিজের হলের রুমে দরজায় মাকসুদার সেই পোস্টার লাগিয়ে দেয়—দেশ আজ বিশ্ববেহায়ার খপ্পরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহ্নির প্রেমে পড়েছে সরিষা সানা।

সরিষা সানা গায়ে মাখে সরিষার তেল।

তার রেজাল্ট খারাপ। সে প্রায়ই ফেল করে পরীক্ষায়।

আর বহ্নির রেজাল্ট খুব ভালো। সে ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়। এই ক্যাম্পাসের সবচেয়ে সুন্দর মেয়ে সে। পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তার মেয়ে এবং টেনিস খেলে।

বন্ধুরা সানাকে বলে, 'কী রে সরিষা, তোর প্রেমের খবর কী? শুনলাম তোর সাথে বহ্নির বিয়া? ফিফটি পারসেন্ট কনফার্ম।'

'বলিস কী। বলিস কী। কই শুনলি দোস্ত? বল তো ডিটেইলে।'

তখন বন্ধুরা বলে, 'তোর সাথে বহ্নির বিয়া। ফিফটি পারসেন্ট কনফার্ম। তুই রাজি। এবার বহ্নি রাজি হলেই হয়। ওর রাজি হওয়াটাই কেবল বাকি।'

'আচ্ছা, ফিফটি পারসেন্ট রাজির ব্যাপারটা কী?'

'আরি হারামজাদা, এই সোজা অঙ্ক বুঝো না। তোমার ফিফটি পারসেন্ট বহ্নির ফিফটি পারসেন্ট। তুমি রাজি। বহ্নি রাজি হলেই পুরাটা হয়ে যায়?'

সরিষা সানা সরল মুখে জিগ্যেস করে, 'বহ্নি কি রাজি হবে?'

'সেটা আমরা বুঝব কী করে? সেটা তো তোর বোঝার কথা। তুই বল, বহ্নি কতটা রাজি? সে কি তোকে ভালোবাসে?'

সরিষা সানা বলে, 'ওর মুখ দেখলে তো তা-ই বোঝা যায়। বুঝিসই তো। মেয়েদের মন বোঝা কত কঠিন। বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না।'

'বহ্নির বুক তো ফেটে যাচ্ছেই। জামা, ব্লাউজ কোনো কিছুতেই ওর বুক আটকানো যায় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দূর। তোরা খুব বাজে বকিস। আমার সাথে ওর যে সম্পর্ক এটা অতি পবিত্র।'

ইলেকট্রিক্যাল ডে পালন করা হবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে এ উপলক্ষে। বহ্নি নাচবে।

সানাকে দেখা যায়, রিহার্সালে গিয়ে হাজির। বহ্নি কোন নাচটা নাচবে, তার গান কী হবে, কোন ক্যাসেটে সেই গানটা আছে, এই সব দায়িত্ব তুলে নিয়েছে সরিষা সানা। সবাই মুখ টিপে টিপে হাসে, সরিষা সানা নির্বিকার। একই সঙ্গে নির্বিকার বহ্নিও। সানাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে তার কোনোই অসুবিধা হচ্ছে না।

শওকতের সঙ্গে বহ্নির দেখা টেনিস কোর্টে।

ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। শওকত জানে, এখন শিক্ষক হওয়াটা কেবল সময়ের ব্যাপার। রেজাল্ট হতে এখনো বাকি আছে কয়েক দিন। ক্লাস হচ্ছে না। তবে হলগুলো খোলা। শওকত এখনো নজরুল ইসলাম হলেই আছে। সেখান থেকে সে একেবারে উঠে যাবে শিক্ষকদের ডরমিটরিতে। এই তার পরিকল্পনা।

বহ্নি টেনিস কোর্টে এসেছে। টেনিস না খেলে সে থাকতে পারে না।

শওকতের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়।

শওকত তক্কে তক্কেই ছিল। বহ্নিকে সে একটা প্রশ্ন করতে চায়। করেই ফেলে। বলে, 'বহ্নি শোনো, সরিষা সানা ছেলেটা তো তোমার প্রেমে পাগল হয়ে গেছে। তোমার নামে সে কবিতা লেখে। প্রেমিকা আমার তন্বী, সে যেন এক বহ্নি। সারা ক্যাম্পাসের সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে।'

বহ্নি ব্যাটের গোড়াটা ডান হাতে লাটিমের মতো ঘোরাতে ঘোরাতে বলে, 'সবাই সরিষা সানা ভাইকে নিয়ে হাসাহাসি করে নাকি?'

'হ্যাঁ করে।'

'করা উচিত নয়।'

'ওকে নিয়ে হাসাহাসি করা উচিত নয় বলছ।'

'হ্যাঁ।'

'তোমার সঙ্গে তার প্রেম, সে তা-ই বলে বেড়াচ্ছে। তার পরেও লোকে হাসবে না!'

'না, হাসবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন?'

'কারণ, প্রেম একটা অত্যন্ত সিরিয়াস বিষয়।'

'তা বটে। কিন্তু তুমি তো আর তাকে ভালোবাসো না। তাই না?'

'কে বলল বাসি না। আমি অবশ্যই সানা ভাইকে ভালোবাসি।'

'সবাই জানে, তোমার প্রেম ইলেকট্রিক্যালের টিচার আরেফিন ভাইয়ের সাথে। তুমি তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ। বিয়ে করে উনিও আমেরিকা চলে যাবেন। তুমিও যাবে।'

'আরি, বিয়ের কথা আসছে কোত্থেকে। আমি তো বলছি ভালোবাসার কথা।'

'তুমি সানাকে ভালোবাসো।'

'হ্যাঁ।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও। আমি বুঝতেছি না জিনিসটা। তুমি ভালোবাসো সানাকে, আর বিয়ে করতে যাচ্ছ আরেফিন ভাইকে।'

'নট এক্সাক্টলি...আমি সানা ভাইকে ভালোবাসি। আমি আপনাকেও ভালোবাসি। আমি এই বুয়েটের সবাইকে ভালোবাসি।'

'ও, আচ্ছা। আমি এই ভালোবাসার কথা বলছি না। আমি বলছি অ্যাফেয়ারের কথা। তোমার সাথে কি সরিষা সানার প্রেম?'

'দেখেন, আমার দিক থেকে যাকে বলে প্রেম, তা না। কিন্তু তার দিক থেকে তো বটেই।'

'সে তোমাকে ভালোবাসে। তুমিও তাকে ভালোবাসো। তবে তোমারটা প্রেম না। তারটা প্রেম।'

'জি, হতে পারে।'

'তার পক্ষ থেকে প্রেম হলে তোমার কোনো অসুবিধা নাই?'

'জি না। কী অসুবিধা?'

'সবাই যে হাসাহাসি করে।'

'বললাম তো, প্রেম অত্যন্ত সিরিয়াস একটা ব্যাপার। এটা নিয়ে হাসাহাসি করা উচিত না।'

'তুমি তো কোনো দিনও তার প্রেমে রেসপন্ড করবা না। তাইলে তুমি তাকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাচ্ছ কেন?'

'মাইন্ড ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ, শওকত ভাই। আমি মোটেও কাউকে নাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দড়ি দিয়া ঘুরাই না।'

'অবশ্যই ঘোরাও। ও তোমার পেছনে পেছনে ঘোরে। তুমি তাকে দিয়ে ফাই-ফরমাশ খাটিয়ে নাও।'

'নো, নেভার। আমি তাকে দিয়ে ফাই-ফরমাশ খাটাই না। ইলেকট্রিক্যাল ডের রিহার্সাল করি। উনি কবিতা পড়বেন। আমি নাচ করব। একসঙ্গে রিহার্সাল তো করতেই হবে।'

'কী জানি। তোমরা যারা শহরের ছেলেমেয়ে, তোমাদের মন-মানসিকতা আমরা বুঝতে পারি না। আমরা গ্রামের ছেলে তো। আমাদের বিশ্বাস, প্রেম জীবনে একবারই আসে। একটা ছেলে একটা মেয়ে কেবল একজনকেই ভালোবাসতে পারে। আর তারা দুজনে মিলে সংসার করতে চায়।'

'ওয়েল। আপনি একটা জটিল দার্শনিক কথা বলেছেন। এইটা নিয়ে আর্গুমেন্ট করতে হলে সময় নিয়ে করতে হবে। টেনিস কোর্টে তো সেটা সম্ভব না। আসেন, বরং প্র্যাকটিস করি। বাহ্, আপনার তো ভালো উন্নতি হয়েছে। আপনি তো এখন রীতিমতো ম্যাচ খেলতে পারবেন। আপনার পায়ের ব্যথা কমল?'

'হ্যাঁ, কমেছে। তবে এরশাদ যখন টেলিভিশনে কবিতা পড়ে, তখন বেড়ে যায়।'

'হাহাহা। ভালো বলেছেন।'

শওকত সেই রাতে অনেক ভেবেছে বহ্নির সঙ্গে তার কথোপকথন নিয়ে। বহ্নির দিক থেকে যুক্তির কোনো অভাব ছিল না। শওকত তার কথার প্যাঁচে হেরেও গেছে। কিন্তু শওকতের মন থেকে তো সংস্কার যায় না।

সোনিয়ার চিঠি পাওয়ার পর সে ছুটে গিয়েছিল বাড়িতে। সোনিয়াকে একনজর দেখার জন্য।

বাড়িতে গিয়েই সে ব্যাগ রেখে ছুটে গেছে নুরুল স্যারের বাড়িতে। 'সোনিয়া আছ নাকি?' সোনিয়া বাড়িতে ছিল না। সে প্রাইভেট পড়তে কোনো এক স্যারের বাড়ি গিয়েছিল।

তখন সকাল ১১টার মতো বাজে, আমলকীগাছের নিচে পাতা পড়ে ছিল অজস্র। সমস্তটা গাছ পাতাশূন্য। সেই ডালপালার ফাঁক দিয়ে নীল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশের দিকে তাকিয়ে শওকতের মনে হচ্ছিল, প্রতীক্ষার এই প্রহর বুঝি কোনো দিনও শেষ হবে না। স্যারের স্ত্রী তাকে নানা প্রশ্ন করছিলেন, যেমন—'বাবা, তুমি কখন আসিলা, কেমন আছ, ঢাকার খবর কী?' এসবের জবাব সে নিশ্চয়ই দিয়েছিল, কিন্তু কী দিয়েছিল, তার মনে নাই। তার কেবল মনে আছে, সে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল, উৎকর্ণ হয়ে ছিল, কখন আসবে সোনিয়া।

সোনিয়া এসেছিল অনেকক্ষণ পর, ঘড়ির কাঁটা বলবে দুই ঘণ্টা, কিন্তু শওকতের মনে হয়েছিল দুই বছর, দুই যুগ। ড. আলী আসগর স্যার ফার্স্ট ইয়ারে ফিজিকস ক্লাসে তাদের পড়িয়েছিলেন আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, থিয়োরি অব রিলেটিভিটি, 'আলো গুচ্ছ গুচ্ছ আকারে চলে', ধরা যাক, এ একটা নৌকা, বি আরেকটা নৌকা, এ-এর তুলনায় বি-এর যে গতিবেগ...এত পড়ানোর দরকার ছিল না। সময় আসলে সব সময় একই গতিতে প্রবাহিত হয় না, সময় কখনো কখনো দ্রুত চলে যায়, কখনো কখনো তার গতি থেমে যায়, যেমন সোনিয়ার জন্য অপেক্ষা করার দুপুরবেলাটিতে সময় থমকে গিয়েছিল। আবার যখন সোনিয়া এল, বলল, 'আপনি আসছেন, আমি জানতাম আপনি আসবেন,' তখন তার সময় কত দ্রুত বইতে শুরু করল।

'তুমি কেমন করে জানলা আমি আসব।'

'আমার অন্তর ডাকি বলল, শওকত ভাইজান আসবে।'

'তোমার অন্তর ডেকে বলল?'

'হ্যাঁ। আমি সব বুঝি। আপনি বসেন। ভাত খায়া যাবেন।'

'না। মা তো আমার জন্য ওয়েট করবে। তার সাথে খেতে হবে।'

'তাইলে চলেন আমিও আপনার সাথে যাই। চাচি আম্মাকে তো হেল্প করা লাগবে।'

'চলো।'

আবারও সেই পথ। শটিবনের পাশ দিয়ে, ঢোলকলমি জঙ্গলের ধার দিয়ে, শিমুলতলা ধরে, বাজে পোড়া তালগাছ পেরিয়ে দুটো পুকুরের মধ্যের সরু পথ বেয়ে তারা পৌঁছায় শওকতদের ভিটায়।

তখন বাঁশঝাড়ের অন্ধকার তলায় সে সোনিয়ার হাত ধরে বসে এবং বলে, 'সোনিয়া, আমি তোমার জন্যই আসছি। আমি তোমাকে ভালোবাসি, সোনিয়া।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পাগল। চলেন, বাড়ি চলেন।'

আশ্চর্য। সোনিয়া তার কথার জবাবে ভালোবাসার কথা বলল না।

পরে মা যখন গোসল করতে যায়, সোনিয়া রান্নাঘরে, তখন রান্নাঘরে ঢুকে শওকত পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছিল সোনিয়াকে।

তার পিঠে-ঘাড়ে-কানে চুমু দিতে দিতে বলেছিল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, সোনিয়া। তুমি আমাকে ভালোবাসো না?'

'সরেন। চাচি আম্মা আসবে।'

'আসুক। তুমি আমার বুকে আসো।'

সোনিয়াকে সে বুকে টেনে নিয়েছিল।

কিন্তু ওই সময় তার মনে পড়েনি সোনিয়ার বুকে আদর করার কথা।

এখন হলের বিছানায় শুয়ে তার সোনিয়ার শরীরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় সম্পদটির কথা কেন মনে পড়ছে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মৌটুসির জন্য পঙ্‌ক্তিমালা'—নামটা কেমন?

সানাকে জিগ্যেস করে মাকসুদার।

'ভালোই তো। তবে ধর, নামটা যদি হতো, বহ্নির জন্য পঙ্‌ক্তিমালা, তাইলে আরও ভালো হতো। তাই না?' সানা বলে।

বুয়েটের শহীদ মিনারে বসে গল্প করছে দুজন। সন্ধ্যাবেলা। ফুরফুরে বাতাস বইছে। হেমন্তকালের আকাশ পরিষ্কার। আকাশে অনেক তারা। একটা চাঁদও আছে।

মাকসুদার বলে, 'সে কী করে হয়। এটা তো তোর বই না। আমার বই।'

সানা বলে, 'দেখ, বহ্নি মানে আগুন। দেশের পরিস্থিতি গরম। দেশের মানুষ এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করছে। এই অবস্থায় মৌটুসির জন্য পঙ্‌ক্তিমালা লোকে ভালোভাবে গ্রহণ করবে না। কিন্তু বহ্নির জন্য পঙ্‌ক্তিমালা লোকে সহজভাবে নেবে। আগুনের জন্য পঙ্‌ক্তিমালা।'

মাকসুদার বলে, 'তুই শালা সরিষা সানা হলে কী হবে, তোর তো কবিতার সেন্স ভালো রে। না, নামটা আরেকটু রহস্যময় করতে হবে। অক্সিমরন।'

'অক্সিমরন মানে?'

'মানে হলো ধর বিপরীতধর্মী দুইটা কথাকে একসাথে করা। যেমন ধর, কালো বরফ। বা ধর, চাঁদের অমাবস্যা। বা ধর, সাদা রাত। বা ধর, তপ্ত তুষার। যে জলে আগুন জ্বলে বা ধর, নন্দিত নরকে।'

'তুই তাইলে কী করতে চাস নামটা?'

'ভাবি। তুইও ভাব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বই করবি?'

'হ্যাঁ।'

'টাকা পাবি কই?'

'রক্ত বেচব?'

'রক্ত বেচবি? রক্ত বেচে কবিতার বইয়ের খরচ উঠবে?'

'উঠবে না। কিন্তু এটার একটা তাৎপর্য দাঁড়াবে। আমার রক্ত দিয়ে বের করা বই।'

'তুই শালা একটা কবি।'

'সেটা সবাই জানে। এই ক্যাম্পাসে আমার নাম তো কবিই। সেদিন ক্লাসে স্যারও বলেছেন এই কবি, তুমি বলো...'

'শোন, নাম পেয়ে গেছি।'

'কী?'

'মানব না, মৌটুসি!'

'কী হলো এটা।'

'অনুপ্রাস হলো। ম-য়ে ম-য়ে।'

'কে মানবে না, কেন মানবে না, কেন মৌটুসি।'

'সেটা জানতে হলে পড়ুন কবিতার বই। কবি মাকসুদার রাহমান রচিত...'

AMARBOI.COM

শেষ পর্যন্ত নামটা ঠিক হয়, 'জেগে ওঠো, মৌটুসি'। এটা ঠিক করে দেন রব্বানি জব্বার। তিনি একটা ছাপাখানার মালিক। কিন্তু শিল্পসাহিত্য নিয়ে উৎসাহ আছে তাঁর। তাঁর ছাপাখানা থেকেই বইটা ছাপা হবে। তিনি ছাপার খরচ নেবেন না। কাগজের দাম দেবেন মোজাম্মেল বাবু। তাঁর কম্পিউটারের ব্যবসা। তবে রক্ত বেচার আইডিয়াটা সে কার্যকর করতে পারে না।

পিজি হাসপাতালের বহুতল ভবনের পেছনের সিঁড়ি দিয়ে সে উঠেছিল ব্লাড ব্যাংক পর্যন্ত। সেখানে গিয়ে সে বলে, 'আমি রক্ত বেচব। নিবেন?'

ওরা বলে, 'আমরা তো রক্ত কিনি না। যাদের ব্লাড লাগে, তারা ডোনারদের কাছ থেকে অনেক সময় কেনে। কিন্তু আমরা প্রফেশনাল ডোনারদের কাছ থেকে রক্ত নেওয়া পছন্দ করি না। ওরা বেশির ভাগই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেশাটেশা করে। সিরিঞ্জ দিয়ে নেশা করে। জন্ডিসসহ নানা রকমের অসুখবিসুখ থাকে। তার চেয়ে ভালো হলো নিজেদের মধ্যে কেউ যদি ব্লাড ডোনেট করে। আপনি রক্ত দিতে চান? দান করলে আমরা নিতে পারি।'

'আচ্ছা, দানই করি তাহলে।'

মাকসুদার রাহমান শুয়ে পড়ে ব্লাড সেন্টারে।

হাতে একটা ব্যান্ড বাঁধা হয়। তারপর সে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। সিরিঞ্জটা তার হাতে ঢুকিয়ে বিছানার চেয়ে নিচে ব্যাগ রেখে রক্ত টেনে নেওয়া হয়। মাধ্যাকর্ষণের সূত্র মেনে ব্লাড চলে যায় ব্যাগে।

রক্ত দেবার পর বুকের ভেতরে পেটের ভেতরে কেমন যেন করতে থাকে মাকসুদারের। আসলে তার ওজন কম। ভালোমতো খাওয়াদাওয়া হয় না। অ্যাসিডিটির সমস্যাও আছে। বুকের ভেতরে অম্লের ব্যথা শুরু হয়েছিল। নার্স তাকে সেভেন আপ খেতে দেন। অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে সে জিরিয়ে নিয়ে ধাতস্থ হবার চেষ্টা করে।

মৌটুসিকে নিয়ে কবিতা মানে সব কটা আর্কিটেকচারের মৌটুসিকে নিয়ে নয়।

যখন যাকে ভালো লেগেছে তাকে নিয়েই সে কবিতা লিখেছে।

যেমন তার অনেকগুলো কবিতা আছে শাম্মীকে নিয়ে।

এই মেয়েটার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে।

আটাশির বিখ্যাত বন্যার সময়।

সারা দেশ বন্যার জলে থইথই হয়ে যায়। পদ্মা মেঘনা যমুনা তিন নদীর পানি একই সময় যায় বেড়ে। জলমগ্ন হয়ে পড়ে পুরো দেশের বেশির ভাগ এলাকা। পানি উঠে যায় ঢাকা শহরেও। গুলশানে হাঁটুপানি। মার্কিন দূতাবাসে গোড়ালিপানি। রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে কোমরপানি।

এরশাদ সাহেব গান লেখেন। শোনা যায়, এটা লিখে দিয়েছেন সৈয়দ আলী আহসান। তবে লোকে বলে, গানের কথার যা ছিরি, সৈয়দ আলী আহসান লিখলে তো কথা আরেকটু ভালো হওয়ার কথা।

তোমাদের কাছে এসে বিপদের সাথি হতে আজকের এ চেষ্টা আমার...এই গানটা টেলিভিশনে প্রচারিত হয় সারাক্ষণ। আর ছবিতে দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়, গামবুট পরা এরশাদ বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এটা-ওটা তুলে দেন তাদের হাতে...

সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ত্রাণকার্যের সমন্বয়কেন্দ্র খোলা হয় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের পক্ষ থেকে। সবগুলো ছাত্রসংগঠনের কর্মীরা, সংস্কৃতিকর্মীরা দিনরাত পরিশ্রম করতে লাগলেন। সারা দিন-রাত টিএসসিতে রুটি বেলা হচ্ছে, রুটি সেঁকা হচ্ছে। স্যালাইন বানানো হচ্ছে। সেসব প্যাকেট করে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে দেশের বিভিন্ন এলাকায়।

মাকসুদার ওই সময় রুটি বানাত টিএসসিতে গিয়ে।

তার পাশে রুটি বানাত একটা লম্বাটে শ্যামলা মেয়ে।

ওই মেয়েকে দেখে মাকসুদার কবিতা লিখে ফেলে :

ওই মেয়েটি বিষাদ অবনতা
ওই মেয়েটির চোখের মধ্যে পুকুর
ওই মেয়েটি স্বপ্ন খোঁটে নখে
ওই মেয়েটি শান্ত সন্ধ্যাবেলা
বুকের মধ্যে ওই মেয়েটির ছায়া
ছায়ার মধ্যে ওই মেয়েটি নেই

AMARBOI.COM

মেয়েটিকে যখন সে এই কবিতাটা পড়ে শোনায়, মেয়েটি বলে, 'আপনি কবি নাকি। কবিতা লেখেন। দুরো, আমি আধুনিক কবিতা বুঝি না।'

মেয়েটির নাম ছিল শাম্মী।

সে পড়ত ইডেনে।

থাকত ঢাকা ইউনিভার্সিটির রোকেয়া হলে।

তখন মাকসুদার বলে, 'আপনার কবিতা বুঝতে হবে না, কারণ, আপনি নিজেই কবিতা।'

মেয়েটি বলে, 'আপনার রুটি বানানোর হাত তো চমৎকার। আপনার রুটি তো রেকর্ড প্লেয়ারের রেকর্ডের মতো ঘুরছে। আপনি রুটির দোকানে কাজ করতেন নাকি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকসুদার বলে, 'আমি কাজ করিনি। আমার পূর্বপুরুষ রুটির দোকানে কাজ করেছেন।'

'তাই নাকি? সত্যি?'

'হ্যাঁ। আপনিও চিনবেন আমার পূর্বপুরুষকে।'

'আমিও চিনব। কে?'

'কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি ময়মনসিংহে রুটির দোকানে কাজ করতেন।'

'কাজী নজরুল ইসলাম আপনার আত্মীয়?'

'হ্যাঁ। পৃথিবীর সব কবিই আমার আত্মীয়। জীবনানন্দ দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সবাই।'

'যাহ্। আপনি বানিয়ে বলছেন।'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'বানিয়েই তো বলছি। সব কবি আমার পূর্বপুরুষ। কারণ, আমি কবিতা লিখি।'

'দুর। কবিদের আমার ভালো লাগে না।'

পরে ওই মেয়েটা তার রুমে এসে হাজির।

দারোয়ান মোখলেস ভাই যখন এসে বলে, 'মাকসুদার স্যার, আপনার গেস্ট,' তখন মাকসুদার অবাক। 'আমার গেস্ট?'

'হ্যাঁ। লেডিস গেস্ট।'

শুনে তো মাকসুদারের আকাশ থেকে পড়ার অবস্থা। সে তাড়াতাড়ি লুঙ্গি ছেড়ে প্যান্ট পরে নিচে নেমে যায়।

গেস্টরুমের সামনে গিয়ে দেখে, আরেকজন বন্ধুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শাম্মী।

শাম্মী বলে, 'পরিচয় করিয়ে দিই, ওর নাম রোখসানা।'

মাকসুদার বলে, 'আমার একজন বন্ধু আছে, সানা। আপনি রোখসানা, ও শুধু সানা।'

রোখসানা রসিকতাটা ধরতে পারল বলে মনে হয় না।

শাম্মী বলে, 'শোনেন, আপনি বুয়েটে পড়েন, এটা আগে বলবেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কবিদের পছন্দ করি না, কিন্তু বুয়েটের ছেলেদের আমার খুব ভালো লাগে। তারা খুবই স্মার্ট হয়।'

মাকসুদার সঙ্গে সঙ্গে হতাশ হয়। তার গুরুত্ব সে বুয়েটে পড়ে বলে নয়, সে কবিতা লেখে বলে। তার ডানা আছে, কেউ সেটা দেখতে পায় না, তাই সে মানুষের সমাজে বসবাস করে, আসলে তো তার থাকার কথা আকাশে।

মাকসুদার বলে, 'আমি বুয়েটের সাড়ে তিন হাজার ছেলের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, শাম্মী। আপনি দেখেন কাকে আপনার স্মার্ট লাগে। আমি আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং করব না। আমি কবিতা লিখব।'

'কী বলেন না বলেন।'

'হ্যাঁ। আপনি বসেন। আমি আমার বন্ধু সানাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও খুব স্মার্ট।'

'আরে, আমি সানার কাছে এসেছি নাকি। আমি আপনার কাছে এসেছি।'

'খুব ভালো করেছেন। দেখা হলো। এখন আপনি আসতে পারেন।'

মেয়েটিকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে মাকসুদার বেশ মন খারাপ করে রইল—ওকে আমি দুঃখ দিতে গেলাম কেন? আমি তো কবি। আমার কাজ হলো ঝরা পালকের জন্য বেদনা পাওয়া। আমি সারাটা পৃথিবীর হয়ে দুঃখ পাব। আমি কেন এই মেয়েটার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করতে গেলাম!

এই দুঃখবোধ নিয়ে সে তিনটা কবিতা লিখে ফেলে। কিন্তু প্রত্যেকটা কবিতাতেই সে শাম্মীর বদলে মৌটুসি নামটাই ব্যবহার করে।

সুনীলের আছে নীরা।

মাকসুদারের আছে মৌটুসি।

ইউসুফ হাসানই প্রচ্ছদ এঁকে দেন। বেরিয়ে যায় কবি মাকসুদারের কবিতার বই। *জেগে ওঠো, মৌটুসি*। সেই বই নিয়ে মাকসুদার যায় বইমেলায়। একটা মাদুর বিছিয়ে বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের পাশের আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে পড়ে। গাছে আমের মুকুল, সন্ধ্যার পর আকাশে বাঁকা চাঁদ, একটা কোকিলও ডাকছে, নিচে একমাথা চুল নিয়ে দাঁড়িয়ে কবি মাকসুদার রাহমান।

বুয়েটের ছেলেমেয়েরা যেই আসে, সেই এই বই কিনে নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধূলি ওড়ে বইমেলায়, ধূলি জমে মাকসুদারের চুলে, জিনসের শার্টের হাতলে, কিন্তু তার প্যান্টের পকেটে জমে খুচরো টাকা, তার বুকপকেটে জমে ওঠে জোনাকি, আর জোছনা।

সে বইমেলার ভেতরেই চায়ের স্টলে যায়।

ওই তো কবি শামসুর রাহমান, কবি মহাদেব সাহা আড্ডা দিচ্ছেন রঞ্জুর চায়ের স্টল গিরিঙ্গিতে। সে-ও গিয়ে বসে তাদের পাশে, একটু দূরত্ব বজায় রেখে। শামসুর রাহমানের ঝুলিতে কম্প্রবক্ষে তুলে দেয় একটা কপি, আরেকটা নিয়ে এগোয় মহাদেব সাহার দিকে। তখনই হুমায়ূন আহমেদ আসেন। তাঁকে দেখে চেয়ার ছেড়ে দেয় মাকসুদার।

আরেক টেবিল থেকে ফেরদৌস নাহার ডাক দেন, 'মাকসুদার, এইখানে এসে বসো।'

মাকসুদার ওঠে। প্রবীণ লেখকদের সঙ্গে একই টেবিলে বসে তার দম আটকে আসছিল। ফেরদৌস নাহারের পাশের চেয়ারে গিয়ে বসে সে।

এই সময় এগিয়ে আসেন কবি মুহাম্মদ সামাদ। তাঁরও একটা কবিতার দুটো লাইন দেয়াললিখন হয়েছে: মুজিব আমার স্বাধীনতার অমর কাব্যের কবি।

'মাকসুদার কেমন আছ?'

'এই তো সামাদ ভাই' বলে মাকসুদার তার দিকে চেয়ার এগিয়ে দেয়।

চাঁদটা ঠিক বর্ধমান হাউসের ছাদে গিয়ে লটকে আছে, হঠাৎ তার চোখ গিয়ে পড়ে চাঁদের গায়ে।

এমন অবাস্তব লাগছে সবকিছু। এই বইমেলা, এই যে তার নিজের বই, এই যে বড় বড় কবিদের সান্নিধ্য—সবকিছু।

তার ভেতরে শুধু জ্যোৎস্না আর জ্যোৎস্না। কান পাতলে বোধ করি এখন সে শিশিরের শব্দও শুনতে পাবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামি ডেকে পাঠিয়েছেন শওকতকে।

শওকত যায় মামির বাসায়।

মামি বলেন, 'শোনো, তোমাকে একটা সিরিয়াস কথা বলার জন্য ডেকেছি।'

'জি মামি, বলেন।'

'শোনো, কারও বাবা গরিব হতে পারে, এটা কোনো অপরাধ নয়। কারণ, জন্মের ওপর আমাদের কারও হাত থাকে না। থাকে, বলো?'

'জি না, মামি।'

'কিন্তু কারও শ্বশুর গরিব হবে, এটা অপরাধ। কারণ, বিয়ের ওপরে আমাদের হাত থাকে। বুঝেছ?'

'জি মামি।'

'তুমি বুয়েটের টিচার। তুমি বিদেশে যাবে পড়াশোনা করতে।'

'জি মামি।'

'তুমি বিয়ে করবে তাকে যে তোমার সাথে তাল মিলায়ে চলতে পারবে।'

'জি মামি।'

'তোমার মার সাথে আমার কথা হয়েছে। আপা এই সব কী বলে। তোমাকে নাকি নুরুল মাস্টারের বেটির সাথে বিয়ে দিতে চায়?'

'মা চায় না। আমিই চাই।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

'মামি, খালি আমার সাথে চলতে পারলে তো চলবে না, আমার মা যার বাবা-মার সাথে চলতে পারবে আমি তো তাকেই বিয়ে করব। তাই না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে, তোমার মা বিয়ে করবে না, তুমি করবে? তুমি চলে যাবে আমেরিকা। একবার আমেরিকা গেলে কেউ আর ফেরে? ওই মেয়ে বদরগঞ্জের গ্রাম থেকে আমেরিকা গিয়ে তোমার সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে? গাড়ি চালাতে পারবে?'

শওকত চিন্তায় পড়ে যায়। মামির কথায় যুক্তি আছে। তবে সেই যুক্তিই সব নয়। সে-ও তো বদরগঞ্জের গ্রাম থেকে এসেছে। সে যদি পারে, তাহলে সোনিয়া পারবে না কেন?

কিন্তু মামির সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

সে বলে, 'মামি আপনার কথা আমি ভেবে দেখব। আসি?'

'না। আসি না। তুমি আমার সাথে চলো। আমি তোমাকে মেয়ে দেখাব। আমার খালাতো বোনের মেয়ে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি পড়ে। মেয়ে দেখতে যেমন সুন্দর, তার আচার-আচরণও তেমনি সুন্দর।'

'মামি আজকে আসি। আরেক দিন দেখব মামি।'

'আচ্ছা, ফটো দেখো। ফটো দেখলেই তোমার পছন্দ হবে।'

'না মামি। ফটো দেখব না। বিয়ে করলে আমার বদরগঞ্জের মেয়েকেই করতে হবে।'

'আরে, কী বলে না বলে। তোমার সাথে কি ওই মেয়ের অ্যাফেয়ার?'

শওকত চুপ করে থাকে।

'শোনো, বিয়ের পরও ডিভোর্স হয়। বিয়ের আগে সবারই একটু-আধটু প্রেম থাকে। সেটা ধরে বসে থাকতে হয় না। আমরা একটা শাড়ি কেনার আগেও সাতবার করে দেখে নিই। বিয়ে করার আগেও দেখে নিতে হবে। বদরগঞ্জের একটা মেয়ে বুয়েটের টিচার আমেরিকা প্রবাসীর বউ হতে পারে না।'

'মামি, খালি আমি পছন্দ করলেই তো হবে না। আমাকেও পছন্দ হতে হবে। তাই না? আমার পা খোঁড়া। আমি পুরানা আমলের মানুষ। হাইফাই সোসাইটিতে চলতে পারব না মামি।'

'আচ্ছা, তোমাকে বিয়ে করতে হবে না। তুমি ফটো দেখো।'

মামি নিজেই ফুজির একটা প্যাকেট খোলেন। দুটো পোস্টকার্ড সাইজের ছবি বের করেন। মেয়ে দেখতে সুন্দর। শওকত দেখে। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে গা করে না। সে সোনিয়াকে ভালোবাসে। এবং সোনিয়াকেই সে বিয়ে করবে।

'আচ্ছা, মামি আসি।'

'মেয়েটা কেমন। বললা না তো।'

'সুন্দর আছে মামি।'

'আমি জানতাম, তোমার পছন্দ হবে। পদ্মিনী ধরনের সুন্দর। মেয়ে চার ধরনের হয়। পদ্মিনী, শঙ্খিনী, হস্তিনী, মর্দানি। এর মধ্যে পদ্মিনী হলো বেস্ট। কাকলি পদ্মিনী টাইপ। তাই না?'

'জি মামি। মাশাল্লাহ।'

'তাইলে আমি আগাই। কী বলো?'

'জি না মামি।'

'কেন?'

'মামি, ও পদ্মিনী টাইপ মেয়ে। ওর খুব ভালো বিয়ে হবে। আমার মতো লেংড়া-খোঁড়াকে ওর বিয়ে করার দরকার নাই।'

'তুমি ল্যাংড়া-খোঁড়া নাকি প্রিন্স টাইপ, সেটা আমরা বুঝব। সেটা নিয়ে তো তোমার কথা বলার দরকার নাই। তুমি রাজি আছ কি না, বলো।'

'জি না মামি। রাজি নাই।'

শওকত উঠে পড়ে।

মামি বেশ জোরে দরজার কবাট বন্ধ করে দেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৌটুসির সাথে দেখা ক্যাফেটেরিয়ায়।

তাকে দেখে মাকসুদারের বুকের পাখি খাঁচাছাড়া হতে চায়।

সে কোথায় মুখ লুকিয়ে বাঁচবে?

মৌটুসি তার টেবিলের দিকেই আসছে। তার সামনে বসে আছে সরিষা সানা।

টেবিলের রং গোলাপি। এসবেস্টসের মতো ম্যাটেরিয়ালের তৈরি। চারপাশে হলুদ রঙের চেয়ার।

এগারোটার মতো বাজে। বাইরে উজ্জ্বল রোদ। বসন্ত কাল। আর্কিটেকচার ভবনের সামনে গাছ থেকে পাতা ঝরছে। আবার নতুন পাতাও গজিয়েছে।

হইহুল্লোড় ক্যাফেটেরিয়া জুড়ে।

মৌটুসির সঙ্গে তার একটা বন্ধু।

মৌটুসি সোজা চলে আসে এই টেবিলে। নিজের ব্যাগ থেকে বের করে একটা বই।

বলে, 'এটা আপনার লেখা বই?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কবিতাগুলো পড়েছি। আমার ভালো লেগেছে। বসি আপনার পাশে?'

'বসো।'

'আপনি তো একদম কবিদের মতো কবিতা লেখেন।'

'থ্যাংক ইউ।'

'এই কবিতাগুলো আপনি কি আমাকে নিয়ে লিখেছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকসুদার কী বলবে। সে বলল, 'না। এইটা আমাদের স্কুলের একটা মেয়ে। আমাদের কো-এডুকেশন স্কুল ছিল। আমাদের সঙ্গে একটা মেয়ে পড়ত। তার নাম মৌটুসি। বেশির ভাগ কবিতা তাকে নিয়েই লেখা। পরে অবশ্য বানিয়ে বানিয়ে একে-ওকে নিয়েও লিখেছি।'

'মেয়েটা তো খুব লাকি।'

সানা বলে, 'হ্যাঁ, ভীষণ লাকি। কবি মাকসুদার রাহমান ওকে অমর করে দিল। চা খাবে?'

'না, সরিষা সানা ভাই। খাব না!'

'ও মা। তুমি আমাকেও চেনো নাকি।'

'আপনাকে কে চেনে না। এই ক্যাম্পাসের সবাই আপনাকে চেনে।'

মৌটুসি চলে যায়। তার নীল রঙের জামায় ঢেউ ওঠে। আর বাতাসে একটা অপরূপ সুগন্ধ ভাসতে থাকে, সমস্ত ক্যাফেটেরিয়াজুড়ে। সমস্ত ক্যাম্পাসজুড়ে। সমস্ত জগৎ-জুড়ে।

ও চলে গেলে সানা বলে, 'এই তুই কেন বললি না, হ্যাঁ, তোমাকে নিয়েই লেখা।'

'কী হতো বললে? ওর তো বিয়ে হয়েই গেছে।'

'বিয়ে হয়ে গেলেই কি কবির প্রেমিকা পর হয়ে যায়?'

'আরে, আপন-পরের কথা কেন আসছে। আমি এখন টিচারের বউকে নিজের প্রেমিকা দাবি করে বিপদে পড়ি আর কি! আমার তো ওকে দরকার নাই। আমার দরকার কবিতার অনুপ্রেরণা। সেটা সে আমাকে দিয়েই যাবে।'

'যা। চা নিয়ে আয়। কুপন কেনা আছে। যাহ্।'

'না। তুই আন। আমার এখন সিগারেট খেতে হবে।'

মাকসুদার একজন বেয়ারাকে ডাকে। দশ টাকার নোট দিয়ে বলে, 'একটা গোল্ডলিফ এনে দাও তো।'

সিগারেট বেয়ারার পকেটেই ছিল। সে বের করে দেয়। মাকসুদার সিগারেট ধরায়। জোরে একটা টান দেয়।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়তে থাকে তার মাথার ওপরে।

সানা বলে, 'ওই হারামজাদা, সিগারেট খাচ্ছিস যে বড়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকসুদার বলে, 'আমি একটা জিনিসকে পোড়াচ্ছি, আমার ভালো লাগছে।'

'হারামজাদা, জানিস, ক্যানসারের জীবাণু খাচ্ছিস।'

মাকসুদার বলে, 'আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে, সানা। তুই বুঝবি না।'

সানা বলে, 'হারামজাদা। নিজের বুক পোড়াচ্ছিস কেন? এখনো সময় আছে। ওঠ। মেয়েটার কাছে যা। তাকে বল, হ্যাঁ, সব কবিতা তোমাকে নিয়েই লেখা।'

মাকসুদার বলে, 'তা যদি আমি বলতে পারতাম! তবে সেই কথাটা তো সত্য নয়। সব কবিতা তো ওকে নিয়ে লেখা নয়।'

'তাতে কী। প্রেমে আর যুদ্ধে নৈতিকতা বলতে কিছু থাকে না। যা। গিয়া বল।'

'না। বলব না। আমি কষ্ট পেতে চাই, সানা। আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কভু নাহি ঢালে। কবিতা লেখার জন্য আমার কষ্ট দরকার। আমি কবি। তোর মনে আছে, একবার আমি বলেছিলাম, আমি ফার্স্ট ক্লাস চাই না। আমি কেবল কবি হতে চাই। তুই বলেছিলি, আমিও কবিও হতে চাই, ফার্স্ট ক্লাসও চাই। মনে আছে? আমি কবি হতে চাই। মৌটুসি চলে গেলেই কেবল সেটা হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব।'

'হারামজাদা, তুই মৌটুসিকে ভালোবাসিস না?'

'বাসি রে। ফর মৌটুসি ওয়াজ আই বর্ন, ফর মৌটুসি আই লিভ, অ্যান্ড ফর মৌটুসি, আই অ্যাম নাউ ডায়িং।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকতের স্কলারশিপের অফার এসেছে।

আমেরিকায় ক্যালটেকে। ক্যালিফোর্নিয়ায়।

যে শোনে ক্যালটেকের কথা, সে-ই চোখ কপালে তোলে।

ওরে বাপ রে। খুব ভালো কলেজ। যাও।

কিন্তু একটা অসুবিধা আছে। এইটি পারসেন্ট স্কলারশিপ। টুয়েন্টি পারসেন্ট নিজে দিতে হবে। সেই টুয়েন্টি পারসেন্টও অনেক টাকা। মাসে আশি হাজার টাকার মতো লাগবে বাংলাদেশি টাকায়।

আর লাগবে টিকিটের দাম।

এত টাকা সে পাবে কোথায়?

বাড়ি থেকে এক টাকাও পাওয়া যাবে না।

বোনদের অবস্থাও এমন-যা যে কেউ তাকে ধার দিতে পারে।

একমাত্র ভরসা মামা।

মামার অফিসে গিয়ে হাজির হয় সে।

মামা বলেন, 'কী ব্যাপার, বাবা। হঠাৎ?'

'দরকার আছে, মামা। একটা সমস্যা।'

শওকত খুলে বলে। ক্যালটেক খুব ভালো ইনস্টিটিউট। এখানে পড়া মানে দুনিয়াজোড়া তার সম্মান। কিন্তু প্লেনের টিকিট, অন্তত দুই মাসের হাতখরচ তার লাগবে। ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করলেও অ্যাকাউন্টে টাকা দেখাতে হবে। সেই টাকা সে পাবে কোথায়?

মামা বলেন, 'তুই তো ভালো সমস্যা তৈরি করলি। অন্য কোনো স্কলারশিপ দেখ। যেখানে হান্ড্রেড পারসেন্ট স্কলারশিপ আসবে।'

'জি মামা। সেটাও দেখছি। কিন্তু ক্যালটেকের কথা যে-ই শোনে, সে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ই বলে, আমার অবশ্যই যাওয়া উচিত।'

'যাওয়া উচিত তো আমিও বলতেছি। কিন্তু টাকা আসবে কোত্থেকে? তুই অন্য কলেজ দেখ।'

বিকালেই ডরমিটরিতে ফোন বেজে ওঠে। শওকত আছে?

বেয়ারা ডেকে দেয় শওকতকে।

শওকত ফোন ধরে, 'হ্যালো।'

'শওকত, শোনো, আমি মামি।'

'জি মামি।'

'তুমি এখনই আমার বাসায় চলে আসো।'

'না মামি, আমার একটা কাজ আছে।'

'আরে, আসো তো। কাজ পরে কোরো।'

শওকত রিকশায় ওঠে। মামির বাড়ি তাদের ডরমের কাছেই।

যেতে পাঁচ মিনিটও লাগে না।

মামি বলেন, 'আসো, এই ঘরে আসো।'

শওকত ঢোকে ওই ঘরে। মামি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেন।

শওকত ভেতরে ঢুকে দেখে মামির হাতে দেখা ছবির সেই মেয়েটি।

শওকত বলে, 'কেমন আছেন?'

মেয়েটি বলে, 'আপনি আমাকে আপনি আপনি বলছেন কেন, শওকত ভাই। আমি আপনার অনেক ছোট।'

শওকত বলে, 'তোমার নাম কাকলি না?'

'হ্যাঁ।'

'শোনো, তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। তুমি আমাকে একটা বিপদ থেকে রক্ষা করো।'

'জি, বলেন।'

'আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসি। তার নাম সোনিয়া। মা তার সঙ্গে আমার বিয়েও ঠিক করে রেখেছেন। মামি তার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে দেবেন না। তুমি কি আমাকে একটু হেলপ করবে।'

কাকলি বলে, 'আরে, আশ্চর্য তো। আপনার মামি আপনাকে আটকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখেছে নাকি। আপনি যান, গিয়ে তাকে বিয়ে করে ফেলেন। এ তো খুব সোজা।'

'তা তো সোজাই। কিন্তু তোমার খালা দরজা বাইরে থেকে আটকে রেখেছেন। আমার ধারণা, তিনি কাজি ডাকতে গেছেন। কাজি এসে তোমার সাথে আমার বিয়ে পড়িয়ে দেবে।'

'আপনি রাজি হবেন না। তাহলেই তো হলো।'

'কিন্তু বলবে, ওরা এক রুমে দরজা আটকে কী কী করছিল।'

'কী করছি আমরা?'

'কিছুই না।'

'তাহলে?'

'তাহলেও একটা ঝামেলা তো হবে।'

'না, হবে না। শোনেন, আপনি যাকে ভালোবাসেন, তাকেই বিয়ে করবেন। আজকের দুনিয়ায় কেউ কাউকে জোর করে বিয়ে দিতে পারে না। আর আপনি আরেকটা মেয়েকে ভালোবাসেন জেনেও আমি আপনাকে বিয়ে করতে যাব কেন। আমি তো নদীর জলে ভেসে আসিনি। তাই না?'

'ঠিক তা-ই।'

কাকলি উঠে দরজা ধাক্কাতে আরম্ভ করে।

একটু পরে দরজা খুলে যায়।

শওকতের মামা দরজা খুলে দিয়েছেন। মামি বাড়ি নাই। তিনি বাইরে গেছেন। সম্ভবত কাজি ডাকতেই। মামা চাবিওয়ালা ডেকে তালা খুলে ওদের বের করেছেন।

কাকলি বলে, 'খালু, আপনার এই বউয়ের সাথে আপনি থাকেন কেমন করে? পুরোই তো পাগল।'

'তাহলে ভেবে দেখো। কেমন করে আছি। আমিও তো পাগল। তাই বোধ হয়।'

কাকলি শওকতের উদ্দেশে বলে, 'শোনেন, আপনি আজ রাতেই বদরগঞ্জ চলে যান। বিয়ে করে বউ নিয়ে চলে আসেন। আমাদের বাসায় বউ নিয়ে আসবেন। কোনো ব্যাপার না।'

শওকত বেরিয়ে যায় মামির বাসা থেকে। রাতে আর ডরমে ফেরে না। সে শহীদ স্মৃতি হলে মাকসুদারের রুমে গিয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকসুদার এমএস কোর্সে ভর্তি হয়েছে। শহীদ স্মৃতি হলে তার সিট পড়েছে এই দফায়। এমএসের কোর্সটোর্স সে করে-টরে না।

চাকরি খোঁজে। ইন্টারভিউ দেয়। স্কলারশিপের টাকা গোনে। আর হলে থাকার সুবিধাটুকু নেয়। বাইরে থাকলে বাড়িভাড়া গুনতে হবে। ব্যাচেলর মানুষকে কেই বা বাড়িভাড়া দেয়।

শওকতকে দেখে সে খুশিই হয়। বলে, 'রাতের খাবার খেয়েছ?'

'না। খাইনি।'

'চলো যাই। আহসানউল্লাহ ক্যানটিনে খাই। ছাত্ররা থাকবে এই সময়। অসুবিধা নাই। চলো যাই।'

তারা ক্যানটিনে বসে। খিচুড়ির অর্ডার দেয়।

শওকত বলে, 'মাকসুদার, তুমি আজ থেকে ১০ বছর পরে নিজেকে কোন জায়গায় দেখো?'

মাকসুদার বলে, 'শামসুর রাহমানের একটা কবিতা আছে, "যদি বাঁচি চার দশকের বেশি/লিখব।...যদি বেঁচে যাই একদিন আরও/লিখব।" ১০ বছর পরেও আমি এই রকমই থেকে যাব। লিখব। তুমি? তুমি নিজেকে কোনখানে দেখো?'

'আমি নিজেকে কোথাও দেখি না, মাকসুদার। তুমি কবি, তুমি কবিতা লেখো, তোমারও একটা নিশ্চয়তা আছে। আমার জীবনটার কোনো এইম নাই, কোনো ডেস্টিনেশন নাই।'

'তোমার কী হয়েছে, শওকত? এইভাবে ভাবছ কেন?'

'না। কিছু হয় নাই।'

শওকত খিচুড়ি খায় চামচে তুলে। খাওয়ার দিকে তার মন নাই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুজনে যায় আহসানউল্লাহ হলের ক্যানটিনে। সেখানেই তাদের সঙ্গে দেখা হাবিবের। আর্কিটেকচারের হাবিব খুবই উত্তেজিত। সে বলল, 'মিয়া, ঘটনা তো ঘটে গেছে।'

'কী ঘটনা?'

'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে কাল বেদম লাঠিচার্জ করেছে। আজকে তিন জোট মিলে একটা রূপরেখা দিয়েছে।'

'সেটা কী রকম?'

মাকসুদার জিগ্যেস করে।

'আট-দলীয় জোট, সাত-দলীয় জোট, আর পাঁচ-দলীয় জোট, সবাই বসেছিল। তারা একটা রূপরেখা দিয়েছে। একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে। সেই সরকারের অধীনে সংসদীয় নির্বাচন আগে হবে।'

মাকসুদার ডিম-খিচুড়ি খেতে খেতে বলে, 'এই রূপরেখার কী এমন সিগনিফিকেনস?'

'বুঝলা না। এই দেশে শক্তি আছে তিনটা। আওয়ামী লীগ, বিএনপি আর আর্মি। ত্রিভুজের দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহুর চেয়ে বেশি। আওয়ামী লীগ-বিএনপি এক হওয়া মানে এরশাদের পতন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। আর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলে পিটুনি দেওয়ায় ঐক্য আরও সংহত হলো।'

মাকসুদার বলে, 'আমার একটা দাঁত ভেঙে দিয়েছে এরশাদ। আমি বরং নির্মলেন্দু গুণের কবিতার ভাষায় বলি, এখনও দুধের দাঁত পড়েনি, তুই আয়ুব খানের দাঁত দেখাস...তবে শাহ মোয়াজ্জেম লোকটা তো বলেই দিয়েছে, দুই মহিলা মিলিত হলে কিছুই উৎপাদিত হয় না।'

হাবিব বলে, 'দেখো, এক মাসের মধ্যেই এরশাদকে বিদায় নিতেই হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিছিল থেকে মিছিলে ছুটে যাচ্ছে মাকসুদার।

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে মিছিল হচ্ছে। মিছিলের স্লোগান :

এক দফা এক দাবি
এরশাদ তুই কবে যাবি?
জনতার দাবি এক
এরশাদের পদত্যাগ।

মাকসুদার পা মেলায় মিছিলে। মিছিলে কবিতা পড়া হচ্ছে। মাকসুদার স্বরচিত কবিতা পড়ছে মিছিলে। মিছিল আবার চলতে শুরু করে। মাকসুদারও হাঁটছে।

ঢাকা শহরটা যেন মিছিলের শহরে পরিণত হয়েছে।

সরকার প্রমাদ গোনে। সরকারের ভয় ছাত্রদের ঐক্যকে।

তারা ছাত্রদলের একটা অংশকে ভাগিয়ে নিতে সমর্থ হয়। অভির নেতৃত্বে ছাত্রদলের একটা অংশ আক্রমণ করতে আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়।

তারা গুলিবর্ষণ করে ছাত্র ঐক্যের মিছিলে।

শুরু হয় গোলাগুলি।

মাকসুদার তখন আশ্রয় নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ক্লাসরুমে। বেঞ্চের নিচে ঢুকে মাথা লুকিয়ে রইল সে।

পরে জানা যায়, ছাত্র ঐক্যের সাতজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে।

পরের দিন আবার ক্যাম্পাসে ঢোকে সরকারের এজেন্টরা। তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে সদ্য পাওয়া ঝকঝকে অস্ত্র।

জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকুর নেতৃত্বে ছাত্ররা খালি হাতে ধাওয়া করে তাদের। ওরা গুলি করে নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর। গুলিবিদ্ধ হয় অনেকেই। কিন্তু হাজার হাজার ছাত্রের ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে যায় সরকারের গুন্ডারা।

ঘটনা ঘটছে খুব দ্রুত।

সারা দেশে মিছিল হচ্ছে এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে। ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় মিছিল হচ্ছে। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা দিয়েছিল সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে নির্দেশ অমান্য করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রেখেছে।

সরকার কারফিউ জারি করে। সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। রাস্তায় নামানো হয় বিডিআর আর সেনাবাহিনী।

সরকার সংবাদপত্রের ওপরে সেন্সরশিপ আরোপ করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবকে দেখিয়ে অনুমোদন নিয়ে তারপর প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। প্রতিবাদে সাংবাদিকেরা ধর্মঘট ডাকেন। সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পেশাজীবীদের সভায় যোগদান শেষে রিকশা করে যাচ্ছিলেন বিএমএর যুগ্ম সম্পাদক ডা. শামসুল আলম খান মিলন।

এরশাদের সমর্থক ছাত্রগুন্ডারা তখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকায় এসেছে একটা সাদা মাইক্রোবাসে করে।

উন্মুক্ত অস্ত্র হাতে নেমে তারা গুলিবর্ষণ করছে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সমবেত বিক্ষোভরত ছাত্রদের ওপর। সেই গুলির একটা এসে লাগে ডাক্তার মিলনের শরীরে। তিনি ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে।

সেই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশ ফুঁসে ওঠে একসঙ্গে।

মিছিলে মিছিলে সয়লাব হয়ে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, শহরের বিভিন্ন মহল্লায় মানুষ বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। পুলিশের সঙ্গে লড়াই বেধে যায়।

দেশে কোনো খবরের কাগজ নাই। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশাবলি-সংবলিত বুলেটিন বের করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মাকসুদার, চলে আসো,' খবর চলে আসে মাকসুদারের কাছে।

সে চলে যায় নয়াপল্টনে।

সাপ্তাহিক *পূর্বাভাস* অফিসে। মোজাম্মেল বাবু সাপ্তাহিক *পূর্বাভাস* নামের আরেকটা কাগজ বের করেন। এরশাদের বিরুদ্ধে খবর আর কলাম ছাপানোই যার প্রধান কাজ।

ওই অফিসে গোপনে মিটিং হচ্ছে। জাসদ ছাত্রলীগ নেতা শফি আহমেদ, জাতীয় ছাত্রলীগ নেতা জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু, এস এম কামাল হোসেন এসেছেন।

সাংবাদিকদের মধ্যে আছেন মোজাম্মেল বাবু, আমিনুর রশীদ, কুদ্দুস আফ্রাদ, আমান উদ দৌলা প্রমুখ। মাকসুদারও রইল সেই সভায়।

ঠিক হলো, সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের বুলেটিন বের করা হবে আগামীকাল। কী কী নির্দেশ থাকবে, জানিয়ে দিলেন নেতারা।

রাস্তায় কারফিউ। এর মধ্যে লেখা হতে থাকে প্রতিবেদন। কম্পোজ হয়।

সারা রাত *পূর্বাভাস* অফিসেই থেকে যায় মাকসুদার।

পরের দিন কারফিউ ভেঙে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

ঘরে পরার পোশাক পরেই মেয়েদের হল থেকে মেয়েরা বেরিয়ে আসে সেই মিছিলে। তাদের হাতে হাতে লাঠি, ঝাড়ু।

সবার মুখে এক স্লোগান :

এক দফা এক দাবি

এরশাদ তুই কবে যাবি।

মাকসুদারও এসে যোগ দেয় সেই মিছিলে। তরুণ সাংবাদিকেরা সবাই সেই মিছিলের সঙ্গে হাঁটছেন।

মিছিলের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে মাকসুদারের মনে হচ্ছে, তার হাত বড় হচ্ছে, এই হাত আকাশ ছুঁয়ে ফেলতে পারে।

এর মধ্যে মোজাম্মেল বাবু বলেন, 'মাকসুদার, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।'

'কী কাজ, বাবু ভাই?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি ডাক্তার মিলনের ওপরে একটা হিউম্যান স্টোরি লিখবে। পারবা না?'

'পারব, বাবু ভাই।'

'ডাক্তার মিলন শহীদ হয়েছেন। এরশাদের লেলিয়ে দেওয়া গুন্ডারা সরকারি এজেন্টদের সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসে গুলি করে মেরেছে ডাক্তার মিলনকে। তার ওপরে প্রতিবেদন করতে হবে।'

মাকসুদার বলে, 'বাবু ভাই, কিছু টাকা ধার দেন।'

'কী করবা?'

'সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি কিনব।'

'কারফিউ-হরতাল, কই পাবা? আমিনুর রশীদের পায়জামা-পাঞ্জাবি আছে।'

'না, সেটাতে হবে না। আমি মাদ্রাসার ছাত্রদের গেটআপ নেব।'

'তাহলে মেয়েদের কামিজ পরো', বাবু ভাই বললে আশপাশের তরুণ সাংবাদিকেরা, যাঁরা সাপ্তাহিক *পূর্বাভাস*-কার্যালয়ে জড়ো হয়েছেন, হেসে ওঠেন।

মাকসুদার বলল, 'আমি আসলে মেয়েদের লম্বা কামিজই নেব।'

সেটাও সে জোগাড় করে ফেলে। এক সাংবাদিক তাঁর প্রেমিকার কাছ থেকে এনে দেন লম্বা ঢোলা কামিজ আর সাদা পায়জামা। মাকসুদারের উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, ফলে পায়জামাটা তার পায়ের গোড়ালির ওপরে উঠে যায়। সবাই হাসে, মাকসুদার বলে, 'আমি এই রকমই চাচ্ছিলাম।'

সে বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে যায়। সেখানে টুপি-গামছা ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে। সে হুজুরদের ঘাড়ের গামছা কেনে, এমনকি ঘিয়ে রঙের একটা কটি পর্যন্ত কিনে নেয়।

আন্দোলনের কদিনে তার দাড়ি কামানো হয়নি। মাদ্রাসার ছাত্র ধরনের পাতলা দাড়ি-গোঁফ হয়েছে তার। সেলুনে গিয়ে সে গোঁফ ছেঁটে ফেলে।

ডাক্তার মিলনের বাসা আজিমপুরে।

সে হেঁটে হেঁটে এগলি-ওগলি করে ঠিকই হাজির হয় আজিমপুরে।

কলোনির বাসা।

অন্ধকার সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার পর চোখে পড়ে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজায় বেশ কিছু জুতা-স্যান্ডেল। বোঝা যায়, এই বাড়িই হবে ডাক্তার মিলনের বাড়ি।

মাথায় টুপি ঘাড়ে গামছা লম্বা পাঞ্জাবি-পায়জামা পরা মাকসুদার ঢুকে যায় বাড়িতে। একদিকে কয়েকজন অল্পবয়সী মাদ্রাসা ছাত্র ঝুঁকে ঝুঁকে কোরআন শরিফ পড়ছে।

মাকসুদার গিয়ে খোঁজে, 'খালাম্মা কোথায়?'

সে টুপি খুলে পকেটে ঢোকায়।

ডা. মিলনের মা ভেতরে ছিলেন। তিনি বাইরের ঘরে আসেন।

মাকসুদার বলে, 'খালাম্মা, আমি সাপ্তাহিক *পূর্বাভাস* পত্রিকা থেকে এসেছি। আমরা সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের একটা বুলেটিন করছি। গোপনে করছি। আপনার একটা ইন্টারভিউ নিই। আর পারলে আমাকে মিলন ভাইয়ের একটা ফটো দেন।'

সেলিনা আখতার, ডাক্তার মিলনের মা, মাথায় বড় একটা ঘোমটা দিয়েছেন, তার মুখখানা বিষণ্ন, যেন পাষাণের ভার বইছেন তিনি, আস্তে আস্তে মুখ খোলেন। ইডেন কলেজের এই শিক্ষিকার চোখে চশমা, অবয়বের মধ্যেই শিক্ষকসুলভ সৌন্দর্য।

'ছোটবেলায় কেমন ছিলেন মিলন ভাই।'

'খুব ব্রিলিয়ান্ট ছিল। সব বিষয়ে উৎসাহ ছিল। এই যে ছবিটা দেখছেন...'

'আমাকে তুমি করে বলেন, প্লিজ।'

'ওই যে ছবিটা, ওইটা মিলনের আঁকা। এই যে ডায়েরিটা, এইটা মিলনের। দেখো, কী সুন্দর হাতের লেখা। কী রকম সুন্দর ছবি আঁকত। আর দেখো, কত ট্রফি। কাপ, শিল্ড। সব মিলন জিতেছে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে খেলাধুলায়। ভলিবল, ফুটবল—সব খেলাতেই উৎসাহ। দেখো ডায়েরিতে কত কবিতা লিখে রেখেছে। কবি ছিল তো ছেলে আমার।'

'আর ভীষণ ভালো ছাত্র ছিল। তেজগাঁও বিজ্ঞান কলেজ থেকে সেকেন্ড স্ট্যান্ড করেছে। নটর ডেম থেকে আইএসসি পাস করেছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি।

'রাজনীতি করত। দেশের মানুষের মুক্তি চায়। স্বৈরাচারী সরকারের পতন চায়। বিএমএর জয়েন্ট সেক্রেটারি। ঢাকা মেডিকেল জাসদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্রলীগের সভাপতি ছিল।'

একটা টেবিলে তাদের একটা পারিবারিক ছবি। ডা. মিলন, তার স্ত্রী আর কোলে একটা শিশু।

মাকসুদার জিগ্যেস করে, 'মিলন ভাইয়ের তো একটাই মেয়ে, না? কত বয়স? কী নাম?'

সেলিনা আখতারের ঠোঁট কাঁপে। চোখে জল আসে। তিনি বলেন, 'শামার বয়স আড়াই বছর। শামার মায়ের নাম কবিতা। কত অল্প বয়সে বিধবা হলো কবিতা। আর শামা মেয়েটার মনে কি ওর বাবার কোনো স্মৃতি থাকবে?'

মাকসুদার উঁকি দিয়ে দেখে, কবিতা ভাবি মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে কোরআন শরিফ পড়ছেন।

আর তার পাশে একটা পুতুল নিয়ে আপন মনে খেলছে ফুটফুটে আড়াই বছরের শিশু শামা।

ডা. মিলন, পাশে কবিতা, তাদের কোলে শামা, একটা আনন্দপূর্ণ ফটো ফ্রেম থেকে খুলে নেয় মাকসুদার। কবিতা ভাবিকে কোনো প্রশ্ন করার সাহস হয় না মাকসুদারের।

তারপর আবার টুপি পরে আল্লাহর নাম নিতে নিতে সে সকালবেলার রোদের মধ্যে আজিমপুর সরকারি কোয়ার্টার্সের পথে বের হয়।

পূর্বাভাস পত্রিকার নয়াপল্টন অফিস পর্যন্ত আসতে তাকে নানা গলি-উপগলি পেরোতে হয়। তিনটা রিকশা সে এরই মধ্যে পাল্টেছে। দারোয়ান তার পোশাক-আশাক দেখে প্রথমে তাকে তো ঢুকতেই দিতে চাচ্ছিল না। 'ওই মিয়া, আমি মাকসুদার' বলার পরে সে হেসে ফেলে এবং ঢুকতে দেয়।

টেবিলে বসে একতাড়া নিউজপ্রিন্ট থেকে গোটা দশেক স্লিপ আলাদা করে নিয়ে বলপেন ধরে মাকসুদার। একটা মানবিক কাহিনি লেখার প্রয়াস পায় মাকসুদার। সে লিখে চলে :

ছোট্ট মেয়ে শামা। বয়স আড়াই। মায়ের পাশে বসে পুতুল খেলছে।

পাশে তার মা কবিতা। কোরআন শরিফ পড়ছেন।

শামা জানে না, তার বাবা নাই। আর কোনো দিনও ফিরে আসবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতার স্বামী ডা. মিলন নিজে ভালোবাসতেন কবিতা। তিনি কবিতা লিখতেন। কবিতা পড়তেন।

আর ভালোবাসতেন মানুষ। ভালোবাসতেন নীলাকাশ। আর কৃষ্ণচূড়া।

একদিন কবিতা বললেন, ওই দেখো আকাশটা কী নীল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিলন কবিতার হাত ধরে বললেন, 'ওই দেখো, কৃষ্ণচূড়া। পাতাগুলো কী সবুজ আর ফুলগুলো কত লাল।'

'তুমি কি আমাকে একটু কৃষ্ণচূড়ার ফুল এনে দেবে?' কবিতা বলেছিলেন।

তরুণ চিকিৎসক, ৩২ বছর বয়সী মিলন বললেন, 'হ্যাঁ, এনে দিচ্ছি। বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে এনে দিতে পারি এক শ আটটা নীল পদ্ম।'

তিনি নিচে নামলেন। কলোনির মাঠে। একটা পিচ্চি টোকাইকে বললেন, 'ফুল পেড়ে দাও তো, বাবু। দশটা টাকা দিচ্ছি।' ছেলেটা এক মিনিটে তরতর করে উঠে গেল গাছে। ফুল নিয়ে নেমে এল।

সেই ফুলের গুচ্ছ কবিতার হাতে তুলে দিয়ে মিলন বলেন, 'আমি তোমার জন্য কৃষ্ণচূড়ার মতো লাল দিন এনে দেব।'

ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও চাকরিতে সরকার খুব ঝামেলা করছিল। তার কোর্স বাতিল করে। তাকে বহিষ্কার করে টেকনিক্যাল কোনো কমিটি থেকে। তাকে বদলি করে পাঠিয়ে দেয় রংপুর মেডিকেলে। আর এইবার, গণ-আন্দোলন যখন তীব্র, তখন ডা. মিলন সক্রিয় হয়ে উঠলেন। প্রকৌশলী কৃষিবিদ চিকিৎসকদের পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের নেতা তিনি। প্রকৃচি বলে সংগঠনটাকে। সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে তারা কাজ করছেন। এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরে যাবেন না।

ওই দিনও, ডাক্তার মিলন ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন বিএমএ অফিসের দিকে, রিকশায়। এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নতুন গতি আনতে হবে, তারই মিটিং ছিল।

টিএসসির কাছে আসতেই এরশাদের লেলিয়ে দেওয়া বাহিনীর এনকাউন্টারের মধ্যে পড়ল তাদের রিকশা। সাদা মাইক্রোবাসে চড়ে এসেছিল তারা, ছাত্রদলের কিছু গুন্ডাপান্ডা নেতা, যারা জেলে ছিল, এরশাদ তাদের টাকাপয়সা দিয়ে কিনে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে পাঠিয়েছে ক্যাম্পাসে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা গুলি ছুড়ছে টিএসসি থেকে মল এলাকা পর্যন্ত বিক্ষোভরত সাধারণ ছাত্রদের ওপর। তারই একটা গুলি এসে লাগল ডা. মিলনের বুকে।

মিলন আর কোনো দিন আসবেন না।

শামাকে বলি, 'মা, তোমার নতুন একটা ডল লাগবে।'

শামা তার ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে গোল চোখের তারায় হাসি ফুটিয়ে বলে, 'বাবা আনতে গেছে।'

সে জানে না, এই বাবা এখন ঘুমোচ্ছেন কাঁচা মাটির ঘরে।

এই লেখা, সঙ্গে শামা, তার মা আর বাবার ছবি।

লেখাটা আর ছবিটা আমিনুর রশীদের হাতে তুলে দেয় সে।

ওদিকে লিখছেন আমান উদ দৌলা। শুকনা-পটকা একটা মানুষ। এক মিনিট পরপর সিগারেট খাচ্ছেন আর কাপের পর কাপ চা।

তিনি প্রধান রচনাটা লিখছেন। তার রচনার হেডিং : স্বৈরাচারের পতন, গণতন্ত্রের অভিষেক। সাপ্তাহিক *পূর্বাভাস* পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যায় বেরিয়েছে শিশিরের কার্টুন। মেথরেরা সুইপার ভ্যানে তুলেছে এরশাদের ফটো। তার শিরোনাম জ্বলজ্বল করছে মাকসুদারের টেবিলের ফাইলে : দূর হ দুঃশাসন।

আমিন লেখাটা পড়ে আর ছবিটা দেখে নিজেই কেঁদে ফেলেন। মাকসুদারকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'সাংঘাতিক লিখেছেন, মাকসুদার ভাই।'

রাতের বেলা সর্বদলীয় ঐক্যের বুলেটিনের মেকাপ হয়। এবার ট্রেসিং বের করতে হবে। পেস্টিং করতে হবে।

তারপর প্লেট বানাতে হবে।

কারফিউয়ের ভেতরে ফ্লপি ডিস্কে পুরো ম্যাটার নিয়ে নয়াপল্টন থেকে ফকিরেরপুলের প্রেসে যান আমিনুর রশীদ, কুদ্দুস আফ্রাদ, বাঁধন সরকার। তাঁরা গলি থেকে উপগলি হয়ে রাজপথ পেরোচ্ছেন, তাঁদের মনে হচ্ছে, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা অপারেশনে অংশ নিচ্ছেন।

পরের দিন ছেলেমেয়েরা ঘেরাও করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবন। সব শিক্ষককে এখনই পদত্যাগ করতে হবে।

শিক্ষকেরা একযোগে পদত্যাগ করার ঘোষণা দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের শিক্ষকেরাও জমা দেন তাঁদের পদত্যাগপত্র।

সেনাবাহিনীর টহল বাড়ে।

কারফিউ।

সব ধরনের সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ। বিভিন্ন জায়গায় জনতা রাস্তায় নেমে শুরু করে দেয় লড়াই।

শুক্রবার।

১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল।

কেউ কাউকে খবর দেয়নি, সবাই ছুটছে বায়তুল মোকাররম মসজিদে। টুপি মাথায় দিয়ে ঢুকে পড়েছে মসজিদে। মসজিদের বাইরের কাতারেও মানুষ।

মসজিদে ঢুকতেই সৈন্যরা বাধা দিতে থাকে সন্দেহভাজনদের। খতিবের হস্তক্ষেপে তারা নিবৃত্ত হয়।

যেই না নামাজ শেষ, শুরু হয় এই কদিনের শহীদদের স্মরণে গায়েবানা জানাজা। জানাজা শেষে হাজার হাজার মানুষের মিছিল বেরোল বায়তুল মোকাররম থেকে। এত বড় মিছিল বহুদিন হয় না ঢাকায়।

সশস্ত্র সৈনিকেরা অবাক ও নিষ্ক্রিয়। তারা কী করে গুলি করবে তাদের ভাইদের ওপর।

মাকসুদার সেই মিছিলে হাঁটছে। তার সঙ্গে তরুণ সাংবাদিক ও লেখকেরা। আমিনুর রশীদ, কুদ্দুস আফ্রাদ, ফজলুল বারী, বাঁধন সরকার, ফজলুর রহমান ও মোজাম্মেল বাবু, সাপ্তাহিক পূর্বাভাসের দল।

বিজয়নগর পানির ট্যাংকের কাছাকাছি চলে আসে তারা। মিছিলের সঙ্গে হাঁটতে কী যে ভালো লাগে। মনে হয়, মিছিল ভেঙে ফেলতে পারবে পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন পাহাড়ও।

মিছিলের সামনের দিকটা চলে গেছে কাকরাইলের মোড়ে। পেছনের দিক তখনো জিরো পয়েন্টে।

কাকরাইল মোড় থেকে পুলিশ গুলি আর কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে শুরু করে।

একটা টিয়ার গ্যাসের শেল এসে পড়ে মাকসুদারের সামনে।

সে দৌড়ে একটা কানাগলিতে ঢুকে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোজাম্মেল বাবু চিৎকার করে বলেন, 'এই এটা কানাগলি। পানি নে পানি নে। টিয়ার গ্যাসে চোখে পানি দিতে হয়।'

মোজাম্মেল বাবুর হাতে বোতল ছিল। পানিতে নিজের শার্টের দুই হাত ভিজিয়ে নেয় মাকসুদার।

গুলি ও টিয়ার গ্যাসের প্রাবল্যে তারা টিকতে পারে না। পল্টনে *পূর্বাভাস* অফিসে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

মাকসুদারের দিনগুলো-রাতগুলো যে কীভাবে যাচ্ছে।

সকালবেলা সে যায় প্রেসক্লাবের সামনে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সমাবেশে যোগ দেয়।

দুপুরে যায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। মিছিলে মিছিলে হাঁটতে থাকে।

এরই ফাঁকে সে একটা অপূর্ব দৃশ্য দেখল।

সুফিয়া কামাল এলেন প্রেসক্লাবে।

সাদা শাড়ি, চোখে চশমা, গায়ে জড়ানো একটা কালো শাল। ছোটখাটো মহিলা, সৌম্যকান্তি, কিন্তু কী যে দৃঢ়তা তার মুখাবয়বে।

পুলিশ পুরো প্রেসক্লাব ঘিরে রেখেছে।

সুফিয়া কামাল এসে দাঁড়ান ফুটপাতে।

পুলিশ বলে, 'খালাম্মা, আপনি চলে যান। সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ।'

সুফিয়া কামাল বলেন, 'আমার কাজ আমাকে করতে দিন। আপনারা চুপ করে থাকুন।'

তিনি একটা কাগজ বের করে সম্মিলিত নারীসমাজের ঘোষণা পড়তে থাকেন।

অমনি আশপাশ থেকে মানুষ আর নারীরা এসে ভরে ফেলে প্রেসক্লাবের সামনের রাজপথ।

সুফিয়া কামাল কারফিউ ভঙ্গ করে তার বিবৃতি পাঠ করে তারপর বিদায় নেন। পরাক্রমশালী পুলিশ অফিসার তার অনুগত সশস্ত্র বিপুলসংখ্যক পুলিশ নিয়ে একজন ছোটখাটো মহিলার ব্যক্তিত্বের সামনে মিইয়ে থাকেন কেন্নোর মতো।

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের বুলেটিন এসে গেছে। সেটা নিয়ে প্রেসক্লাবের সামনে যান তরুণ সাংবাদিকেরা। মাকসুদারও থাকে তাঁদের সঙ্গে। হাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার মানুষ রাজপথে নেমে এসেছে। সচিবালয় থেকে নেমে এসেছে কর্মচারীরা। তারা সবাই সেই বুলেটিন কিনছে, কেউ দিচ্ছে ১০ টাকা, কেউ ৫০ টাকা, কেউবা ৫০০ টাকা।

রাস্তায় মানুষ আর মানুষ।

সেই মিছিলে এসে যোগ দেয় আবীরও। আবীরকে দেখে চিৎকার করে ওঠে শওকত, আর দূর থেকে তাদের দেখে হাত নাড়ে শানু আর তার মেরিন ইঞ্জিনিয়ার স্বামী।

মিছিলে এসে পা মেলায় বহ্নি, অনেক ভিড় ঠেলে সরিষা সানা তার কাছে পৌঁছালে সে তাকে জড়িয়ে ধরে। আশ্চর্য, সানা বহ্নির আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে স্লোগান ধরে, 'জনতার দাবি এক, এই মুহূর্তে পদত্যাগ।'

বাধা দেবার আর কেউ রইল না।

রাতের বেলা টেলিভিশন খবরে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করতে রাজি আছেন, তবে কীভাবে করবেন, কার সঙ্গে করবেন, এটা আলোচনা করতে হবে। কাজেই সবাইকে শান্ত থাকতে এবং রাজনীতিবিদদের আলোচনায় আসতে হবে।

সেই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে লাখ লাখ লোক রাস্তায় নেমে আসে রাত সাড়ে আটটার মধ্যে। তারা স্লোগান ধরে, জনতার দাবি এক, এক্ষুনি পদত্যাগ।

এরশাদের মন্ত্রী শাহ মোয়াজ্জেম বলেন, 'পদত্যাগপত্র কি গুলিস্তানে উড়িয়ে দেওয়া হবে?'

রাস্তায় মানুষ আর মানুষ।

সারা ঢাকায়। সারা দেশে।

এর মধ্যে এসে যোগ দেয় শওকতও।

এর আগে সে কোনো দিন মিছিলে যায়নি। আজ সে মিছিলে নেমেছে। যদিও সে এখন বুয়েটের শিক্ষক, যদিও তার অ্যাডমিশন নিশ্চিত আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে, তবু সে আজ মিছিলের সহযাত্রী। আজ তার পায়ের ব্যথা একদম সেরে গেছে।

রাতের বেলাই সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট মঞ্চ বানিয়ে ফেলে পল্টনের মোড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের দিন সকাল থেকে লাখ লাখ মানুষ সেই মঞ্চের সামনে-পেছনে উল্লাস করতে থাকে।

তিন জোট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে।

এরশাদের উপরাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদ পদত্যাগ করবেন। তখন উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে সাহাবুদ্দীন আহমদকে।

তারপর প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেবেন এরশাদ। তখন সাহাবুদ্দীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন।

চারদিকে গান, কবিতা আর স্লোগান।

দেশ যেন দ্বিতীয়বার স্বাধীন হলো—এমনি একটা ভাব আকাশে-বাতাসে।

হাতে হাতে বিলি হচ্ছে মহাদেব সাহার কবিতার লিফলেট 'বাংলাদেশ চায় না তোমাকে'—

বাংলাদেশ চায় না তোমাকে, তুমি চলে যাও, যাও
কত যে মায়ের খালি বুক ফেলে দীর্ঘশ্বাস
রক্তমাখা হাত, তুমি ক্ষমা চাও, ক্ষমা ভিক্ষা চাও।
তোমাকে চায় না এই সোনালী ধানের খেত, কচি দূর্বা, দীর্ঘ শালবন
চায় না ভোরের পাখি, কলা পাতা, গায়ের উঠোন;
কত না পিতার বক্ষে তুমি জ্বেলেছ আগুন
তুমি চলে যাও, যাও

সেই লিফলেট একটা চেয়ে নেয় মাকসুদার। তার এখন ভীষণ ব্যস্ততা।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে সে। পাশে নাসির উদ্দীন ইউসুফ, শিমূল ইউসুফ। কবিরা আসছেন, শিল্পীরা আসছেন, শমী কায়সার আসেন, মুনিরা বেগম মেমি আসেন।

উফ্। বাংলাদেশের সব মানুষ কি আজ এসে যাবে এই মঞ্চে?

ভিড়ের মধ্যে সে দেখতে পায় মৌটুসির মুখ।

সঙ্গে সঙ্গে তার রক্ত আসে হিম হয়ে, শরীর হয়ে পড়ে অবশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইশারায় মৌটুসি যেন তাকেই ডাকছে।

এত ভিড় ঠেলে সে মৌটুসির কাছে যেতে পারছে না।

তারপর মৌটুসি হারিয়ে যায় তার সম্মুখ থেকে।

আরও খানিক পর বুয়েটেরই একজন জুনিয়র ছেলে তার হাতে একটা খাম দিয়ে যায়।

সেটা মাকসুদার পকেটে রেখে দেয়।

দুদিন পর, যখন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে সাহাবুদ্দীন আহমদ শপথ নিয়ে ফেলেছেন, তখন হলের বিছানায় শুয়ে তার মনে পড়ে সেই চিঠির কথা। বিছানা থেকে উঠে প্যান্টের পকেট থেকে মাকসুদার বের করে খামটা।

খামের মুখ বন্ধ। ওপরে লেখা : কবি মাকসুদার রাহমান।

প্রিয় কবি,

আপনার কাছে আমি সেদিন গিয়েছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম আপনার কবিতার বইয়ের মৌটুসি আমিই কি না।

আপনি বলেছেন, ওটা আমি নই।

আপনি বলেছেন, আপনার স্কুলের এক সহপাঠিনীর নাম মৌটুসি।

শুনে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি।

এর আগেও একবার আপনাকে আমি এই প্রশ্ন জিগ্যেস করেছিলাম। মৌটুসিটা কে? আপনার মনে আছে? আপনি বলেছিলেন, মৌটুসি একটা পাখির নাম। সেবার অবশ্য আমি অত দুঃখ পাই নাই।

মাহবুব আগেই আমেরিকায় চলে গেছে স্কলারশিপ নিয়ে। আমার যাওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না।

আমি একটা অবলম্বন খুঁজছিলাম থেকে যাবার জন্য। সেই আশাতেই আমি আপনার কাছে গিয়েছিলাম।

আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, মাহবুবের মতো ভালো ছাত্র, গুণী আর্কিটেক্ট, বুয়েটের শিক্ষক, শিকাগোতে যে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করছে, তার কাছে না গিয়ে আমি ঢাকায় থেকে যেতে চাচ্ছিলাম কেন।

এই প্রশ্ন আমি অনেক ভেবেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহবুব তো একজন অসাধারণ মানুষ। খুব বড় আর্কিটেক্ট হবে সে। মানুষ, বিল্ডিং, মাটি, প্রকৃতি নিয়ে তার কিছু মৌলিক চিন্তা আছে। ওর এই নতুন চিন্তা আমাদের সভ্যতাকে একটা নতুন দিশা দেবে। আমেরিকায় পড়া শেষ করে সে যদি ঢাকায় ফেরে, বুয়েটের চাকরি তো ওর আছেই, ও ভালো করবে। যদি না ফেরে, আমেরিকান সিটিগুলো ওর মতো প্ল্যানার পেলে বর্তে যাবে। ও যদি অধ্যাপনা করে, পৃথিবীকে নতুন চিন্তা উপহার দিতে পারবে।

আমি তো ওর বউ। আমি একজন মানুষ। আমিও আর্কিটেকচারে পড়ি বলে ওর চিন্তা আমি খানিক উপলব্ধি করতে পারি। ফলে ওর আর আমার যে জুটি, সেটা হতে পারে একটা আদর্শ জুটি। কিন্তু জীবনটা তো শুধু প্রফেশন নয়, শুধু তত্ত্ব নয়। নারী-পুরুষের সম্পর্ক শুধু টাকাপয়সা দিয়ে, প্রফেশনাল সাকসেস দিয়ে বিচার করা যায় না। একজন নারী একজন পুরুষের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হতে চায়। তার কাছ থেকে শুধু প্রেম চায় না, পূজাও চায়। তা না হলে কেন সেকালের রানিরা রাজাকে ছেড়ে কবিদের সঙ্গ পেতে চাইত?

মাহবুবের কোনো দোষ নাই। মাহবুবের কোনো খুঁত নাই। সেটাই মাহবুবের খুঁত। খাদ ছাড়া সোনা হয় না।

আমার মনে হয়, মাহবুব আমাকে তার ছাত্রী মনে করে। কোনো নারী তার স্বামীর ছাত্র হতে চায় না, সব নারীই তার পুরুষের মাথার ওপরের ছায়া হতে চায়।

আমি একদিন মাহবুবকে জিগ্যেস করলাম, তাজমহলের কোন দিকটা তোমাকে বেশি মুগ্ধ করে। মাহবুব বলল, এর জ্যামিতিক সুষমা। এটা একেবারেই নিখুঁত। সিমেট্রির এক আশ্চর্য উদাহরণ।

আমি বললাম, শাহজাহানের প্রেমটা দেখলে না?

ও বলল, তুমি এই সব মিথে বিশ্বাস করো? শাহজাহান তার বেগম মমতাজ মহলের জন্য এটা করেছেন? আমার তা মনে হয় না। এটা তিনি করেছেন নিজেকে অমর করে রাখার জন্য।

হয়তো মাহবুব ঠিকই বলেছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে চাই, তাজমহল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ান্ডার নয়, তাজমহল হলো একজন কবির লেখা কবিতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর সেই কবিতার মূলে আছে মমতাজ।

আমি ভেবেছিলাম, আপনার কবিতার বইয়ের প্রাণের ভেতরে আছি আমি।

আমি জানি, মাহবুবকে ছেড়ে যদি আমি আপনার কাছে যেতাম, সেটা হতো সবচেয়ে বড় পাগলামো। কিন্তু জীবনটা তো স্কয়ার নয়, সার্কেল নয়। জীবনটা হলো ছক না মানা এক আশ্চর্য নদী।

আপনি জানেন, প্রকৃতিতে কোনো সরলরেখা নাই।

মানুষের জীবনও সরলরেখার মতো সোজা নয়।

আমি আপনার কাছে যেতে চেয়েছিলাম, কারণ, অল্প কিছুদিনের জন্য হলেও আপনার সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হতাম আমি।

কেউ এই দুনিয়ায় একটা কিছু করছে, সেই কাজটা আবার শিল্পের কাজ—কবিতা রচনা—শুধু আমার জন্য, এর চেয়ে বড় পুরস্কার একটা মেয়ের জন্য আর কিছুই হতে পারে না।

আমি আপনার কবিতার বইটা বারবার করে পড়েছি। আমার মনে হয়েছে, এই কবিতার নারীটি আমিই।

পৃথিবীতে এমন নারী হয়তো কমই আছে, যে কবির ঘরনি হতে চাইবে, কিন্তু পৃথিবীতে এমন নারী একজনও নাই, যে কবির কবিতার নারী হতে চায় না।

তাই আমি দ্বিতীয়বারের মতো আপনার কাছে গেছি।

কিন্তু আপনার কাছ থেকে আমাকে ফিরতে হয়েছে দ্বিগুণ হতাশা নিয়ে।

আমি আপনার কবিতার মৌটুসি নই।

আপনি একেকবার একেকজনকে নিয়ে এই কবিতা লিখেছেন।

কাজেই আমার তো এমন কোনো উপলক্ষ নাই, এমন কোনো টান নাই, যার জন্য আমি দেশে থেকে যেতে পারি।

আজ রাতেই আমার ফ্লাইট। আমি চলে যাচ্ছি।

আপনি ভালো থাকবেন।

চিঠিটা পড়ে মাকসুদার খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

তার সমস্ত অস্তিত্ব ভেঙে প্রবল এক কান্নার প্লাবন বেরিয়ে আসতে চাইছে। সে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। ভাগ্যিস, রুমে কেউ ছিল না আর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে কাঁদছে তার মৌটুসির জন্য।

এমন কান্নাতেও তো সুখ।

একটু পরে সে বিলাপ করতে শুরু করে।

এ ভালোই হইল পিয়ারি আমি চলিলাম। বুঝিলাম বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না তাহা দূরেও ঠেলিয়া দেয়।

আবার সে বলছে, আমি কী করে বুঝব, তুমি এত বড় সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আমার কাছে এসেছিলে। আমি কী করে বুঝব। কবিরা তো সব সময় সত্যদ্রষ্টা হয় না।

চোখের পানিতে তার গায়ের টি-শার্ট পুরোটাই ভিজে যায়।

একবার সে বলে, 'আমি কবিতা চাই না। কবিতার বই চাই না। আমি শুধু মৌটুসিকে চাই।'

তারপ চোখ মুছে সে হাসে। বলে, 'না, আমি মৌটুসিকে চাই না। শুধু কবিতা চাই।'

বলে সে আবার একা একা হাসে—আমার জীবনে মৌটুসি ও কবিতা দুটোই এসেছিল। নিয়তি আমার কাছ থেকে মৌটুসিকে নিয়ে গেল। কবিতাটা যেন থাকে। কবিতা, তুমি অন্তত আমার সঙ্গে থেকো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সে কী করবে।

মিছিলে তার সঙ্গে হেঁটেছে কাকলিও।

তার দিকে তাকিয়ে সে হেসেছে। হাত নেড়েছে।

মেয়েটাকে তার ভালোই লাগছে এখন।

ওদিকে মামি আবার এসেছিলেন তার ডরমে। তাকে বলেছেন, কাকলি তাকে বিয়ে করতে রাজি আছে।

শওকত বলেছে, না, কাকলি রাজি নাই।

'কাকলি যদি নিজের মুখে তোমাকে বলে, তাহলে কি তুমি ওকে বিয়ে করবে? ও বলবে। কিন্তু একটা গ্যারান্টি ও চায়। তুমি যদি ওকে রিফিউজ করো, তখন তার খুব অপমান হবে। তাই সে আগে থেকেই শিওর হতে চায় যে তুমি রাজি আছ। তুমি বলো যে তুমি রাজি আছ, তাহলে আমি কালকেই কাকলিকে তোমার এখানে পাঠিয়ে দেব। যাও। বলাকা সিনেমা হলে গিয়ে একসাথে সিনেমা দেখো। চায়নিজ খাও। আমি তোমার প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করছি।'

শওকত বুঝছে না যে তার কী করা উচিত।

তার বারবার করে মনে হচ্ছে, সোনিয়াকে পরিত্যাগ করা তার উচিত নয়। কিন্তু তার আমেরিকা যাওয়ার কী হবে তাহলে?

এর মধ্যে মায়ের চিঠি এসেছে।

মা লিখেছেন (আসলে হাতের লেখা সোনিয়ার) :

বাবা শওকত,

একটা জরুরি কথা বলার জন্য তোমাকে এই চিঠি লিখছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি আসো।

তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

সোনিয়ার বিয়ের প্রস্তাব আসছে।

তুমি যদি তাকে সত্বর বিয়ে না করো, তাহলে সোনিয়ার বাবা-মা তাকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দেবেন। সে বেশিদিন অপেক্ষা করতে পারবে না। কাজেই এই চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে তুমি চলে এসো।

চিঠিটা পড়ে শওকতের মনটা বিগড়ে গেল।

সোনিয়া এইভাবে লিখতে পারল?

সে যদি দেরি করে বাড়ি যায়, তাহলে সোনিয়া আরেকজনকে বিয়ে করে চলে যাবে? সোনিয়া তার জন্য অপেক্ষা করবে না?

তাহলে তো তার দেরি করাই উচিত। করুক সোনিয়া আরেকজনকে বিয়ে। সে-ও আরেকজনকে করবে। কাকলি সবদিক থেকে তার উপযুক্ত।

কাকলি আধুনিক। কাকলি শিক্ষিত। কাকলি বড়লোকের মেয়ে। কাকলি ঢাকার মেয়ে। ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী। আমেরিকায় গেলে সে নিজে তো মানিয়ে নিতে পারবেই, শওকতকেও সহযোগিতা করতে পারবে।

সোনিয়া নয়, সে কাকলিকেই বিয়ে করবে। এটাই চূড়ান্ত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত মাকে চিঠি লেখে—

মা,

সালাম নাও।

শোনো, আমার ঢাকায় অনেক কাজ। এখন বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয়।

সোনিয়ার বাবা-মা যদি সোনিয়াকে অন্যত্র বিয়ে দিতে চান, তাহলে দিয়ে দিতে বলো। আমি তাহলে দায়িত্বমুক্ত হই। আমাকে আমেরিকা যেতে হবে উচ্চশিক্ষার জন্য। এই সময় আমি সোনিয়াকে বিয়ে করে দায়িত্ব কাঁধে নিতে চাই না। তুমি তাকে বিয়ে করে ফেলতে বলো।

ওর জন্য আমার দোয়া থাকল। ও নতুন জীবনে সুখী হোক, কায়মনোবাক্যে আমি সেই প্রার্থনাই করি।

তুমি শরীরের যত্ন নিয়ো।

আমি ভালো আছি। আমেরিকা যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ততা খুব বেশি।

তুমি আমার জন্য দোয়া কোরো। যেন আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

ইতি—

তোমারই শওকত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠিটা পৌঁছাতে চার দিন লেগে যায়। যদিও কুরিয়ারে দিয়েছিল শওকত।

মা চিঠি পেয়ে সেটা তুলে দেন সোনিয়ার হাতে।

সোনিয়া চিঠি পড়েই কাঁদতে শুরু করে দেয়।

শওকত কি জানে না, তাকে সে কত ভালোবাসে।

আসলে তো যাতে শওকত তাড়াতাড়ি আসে, আর তার সঙ্গে একবার দেখা হয়, এই জন্য সে এই রকম একটা চিঠি লিখেছিল। কী সে বোঝাতে চেয়েছিল, আর শওকত কী বুঝল।

এখন সে কোথায় যাবে, কী করবে?

সে দরজা বন্ধ করে কাঁদে।

তাকে মা জিগ্যেস করেন, 'এই সোনিয়া, কী হইছে?'

সোনিয়া বলে, 'কিছু হয় নাই।' বলে সে আরও বেশি করে কাঁদে।

বাবা তাকে জিগ্যেস করেন, 'মা, কী হয়েছে।'

সোনিয়া কোনো কথা বলতে পারে না।

কাঁদতে কাঁদতে বুঝি সে অন্ধই হয়ে যাবে।

সে নাওয়া-খাওয়া ছেড়েই দিল।

বিছানায় পড়ে রইল।

তার শরীর ভেঙে পড়ছে। তার চোখ কোটরে ঢুকে গেছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত ঠিক করেছে, সে মামির কাছে যাবে। কাকলিকে বিয়ে করতে সে রাজি।

তাতে তার একটা সমস্যার আশু সমাধান হয়ে যাবে। আমেরিকা যাওয়ার টিকিটের টাকা নিয়ে তাকে চিন্তা করতে হবে না।

মামা এসেছেন ডরমে। শওকতের কাছে।

মামা বলেন, 'শওকত, কী খবর তোর? কত দিন বাসায় আসিস না যে!'

শওকত বলে, 'নানা ঝামেলায় ছিলাম, মামা। আজকে যেতাম। ভেবে দেখলাম, মামির প্রস্তাবটায় রাজি হওয়া ছাড়া আমার কোনো গত্যন্তর নাই।'

মামা বলেন, 'গত্যন্তর আছে। সেই কথাটাই আমি তোকে বলতে এসেছি। শোন, তোর বাপের কাছে ২০ হাজার টাকা ধার নিছলাম। সে আজ থেকে ২৮ বছর আগে। পরে আর শোধ করা হয়নি। আয়, হিসাব কর। প্রথম ৭ বছরে এটা হয়েছে ৪০ হাজার। তারপর ৭ বছরে ৮০ হাজার। তার পরের ৭ বছরে ১৬০ হাজার। তার পরের ৭ বছরে ৩ লাখ ২০ হাজার। এই টাকাটা তোর পাওনা। আমি তোকে প্লেনের টিকিটের দাম দিচ্ছি। প্রথম দুই মাসের টাকা দিচ্ছি। তুই চলে যা। কাকলিকে তোর বিয়ে করতে হবে না।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভীর রাত।

সোনিয়া বালিশে মুখ রেখে কাঁদে খানিকক্ষণ। টিনের চালে গাছের পাতা ঝরে। ঝিঁঝি ডাকে। শব্দ পায় সে।

একটা জোনাক পোকা ঢুকে পড়েছে ঘরে।

জ্বলে আর নেভে।

দূরে কোথাও একটা বেড়াল কাঁদছে। বিড়ালের কান্না করুণ আর ভীতিকর।

বালিশ ভিজে গেছে। বালিশটা উল্টে আবার শোয় সোনিয়া।

তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। আবার তার ঘুম ভেঙে যায়।

সে একটা স্বপ্ন দেখছিল। শওকত তার কাছে ফিরে এসেছে। বলছে, 'আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি, সোনিয়া।'

ঘুম ভেঙে গেলে সে দেখে চারদিকে শুধুই অন্ধকার।

এমন সময় দরজায় কে যেন কড়া নাড়ে। 'সোনিয়া আছ নাকি, স্যার আছেন নাকি?'

নুরুল বিএসসি জিগ্যেস করেন, 'কে?'

'আমি শওকত।'

'এত রাতে কোত্থেকে?'

'ভাঙা বাসে আসলাম। তাই রাত হয়ে গেল। ঢাকা থেকে।'

সোনিয়া তড়াক করে উঠে বসে বিছানায়। বাইরে আসে। ফুটফুটে জোছনা বাইরে। মনে হয় পূর্ণিমা।

পূর্ণিমার আলোয় শওকতকে একজন দেবদূত বলে মনে হচ্ছে। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখের কোণে জল। সেই দুই ফোঁটা জলে যেন দুটো চাঁদ জ্বল জ্বল করছে।

সোনিয়া বলে, 'ভাইজান আপনার চোখে কী হইছে?'

শওকত বলে, 'না তো, কই। কুটা পড়ছে মনে হয়।'

সোনিয়া বলে, 'দেন। কুটা পরিষ্কার করে দিই। ঘরে আসেন।'

সে একটা লণ্ঠন হাতে নেয়। শওকতের চোখের কাছে ধরে। তারপর বলে, লণ্ঠনটা আপনে ধরেন। আমি চোখ দেখি।

সোনিয়া এক হাতে শওকতের চোখ মেলে ধরে। আরেক হাতে ওড়নার খুট নেয়। মুখের থুতুতে ওড়নার কোনাটাকে সুচালো করে নেয়। চোখের কুটা বের করার এই নিয়ম।

মুখে বলে, 'কই, কুটা তো দেখা যায় না।'

শওকত লণ্ঠন নামিয়ে সোনিয়াকে জাপ্টে ধরে। পিষে মারে।

তাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দেয়।

বাইরে নুরুল স্যার কাশি দেন।

আকাশ থেকে খসে পড়ে তারা।

জুঁই ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে কলতলার দিক থেকে।

দক্ষিণের বাতাস বইতে শুরু করেছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবীর সুইডেনে। স্টকহোমে ন্যাভাল আর্কিটেক্ট হিসেবে ভালো একটা চাকরি পেয়েছে সে। জাহাজের নকশা করে। ছোট ছোট জাহাজ। ইয়াট বলে সেগুলোকে।

একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে। দুই বেডরুমের ফ্ল্যাট। দুই বেডরুমের তার দরকার নাই। তবু সে দুই রুমের ফ্ল্যাট নিয়েছে, কারণ ভবিষ্যতে তার দুই বেডরুম দরকার হবে।

একদিন শানু তার তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে উঠে পড়ে বিমানে।

পরশ-পৃথ্বী।

ছোটটার নাম আনন্দ।

পরশ-পৃথ্বীর বাবা তখন সিঙ্গাপুরে।

তার নামে একটা ডিভোর্স লেটার শানু পাঠিয়ে দিয়েছে কুরিয়ার করে।

পরশ-পৃথ্বী যাচ্ছে তাদের টিচারের কাছে।

আর এক বছরের আনন্দ যাচ্ছে তার বাবার কাছে।

শানু যাচ্ছে তার বরের কাছে।

এর মধ্যে পরশ-পৃথ্বী আর আনন্দর বার্থ সার্টিফিকেট বের করেছে সে। সব কটিতেই বাবার নাম দিয়েছে আবীর।

তাদের পাসপোর্ট বের করা হয়েছে। সেসবেও পিতার নামের জায়গায় আবীরের নাম।

শানুর কাজ বড় পাকা।

তবে ডিভোর্স লেটারটা যে বর্তমানের তারিখের, সেইখানে একটু হিসাবের গরমিল থাকল। থাকুক। কাগজে গরমিল থাকতে পারে, হৃদয়ের মধ্যে কোনো ফাঁকফোকর নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শানুর জগতে আবীর ছাড়া আর কোনো কিছুই সত্য নয়।

প্লেনের মধ্যে আনন্দ খুব কান্নাকাটি করে। কানে তুলা গুঁজেও তার কান্না থামানো যায় না।

এমিরেটসের ফ্লাইট স্টকহোমের রানওয়ে স্পর্শ করার খানিক পর আনন্দ কান্না থামায়।

তিনটা বাচ্চা নিয়ে নামে শানু। ছোটটা প্যারাম্বুলেটরে, বড়টা তাকে ঠেলে নিয়ে যায়।

ইমিগ্রেশন পার হতেই শানু দেখতে পায় আবীর দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা ওভারকোট। তাকে একেবারে ইউরোপীয় বলে মনে হচ্ছে।

পরশ-পৃথ্বী দৌড়ে যায় আবীরের কাছে, 'স্যার স্যার...'

আবীর ওভারকোটটা পরে নেয়। হাতটা খালি করে ওদের জড়িয়ে ধরে।

তখন আনন্দকে নিয়ে শানুও আসে তার কাছে। বলে, 'আমাকেও একটু জড়িয়ে ধরো। আর কোলেরটাকে কোলে নাও।'

আবীর জড়িয়ে ধরে শানুকে।

শানু প্যারাম্বুলেটর থেকে কোলে তুলে নেয় আনন্দকে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিবছর ২৮ নভেম্বর আসে। সেলিনা আখতার যান তাঁর ছেলের কবরে। বয়স বাড়ে, তাঁর চশমার পাওয়ার বাড়ে, চুলে আরও বেশি পাক ধরে এবং তাঁর চোখে দৃশ্যপট ঝাপসা থেকে ঝাপসাতর হতে থাকে। ডা. মিলনের হত্যাকারীরা বেকসুর খালাস পায়, এরশাদকে সঙ্গে পাওয়ার জন্য দুই দল কে কত বেশি ভালোবাসা দেবে তারই প্রতিযোগিতায় নামে, প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে জোট বাঁধে, গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিদিন একটু একটু করে ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়, যেমন আকাশে বাড়ে ধুলোর আস্তর, বাতাসে বাড়ে সিসা, নদী থিকথিক করে দূষিত বর্জ্যে, দিন থেকে দিন পরিস্থিতি খারাপ হয়, গণতান্ত্রিক নেতা-নেত্রী দিন দিন অগণতান্ত্রিক হয়ে ওঠেন, খুন-খারাবি-চাঁদাবাজির সীমা থাকে না, খারাপ লোক নেতা হয় এবং আগে খারাপ লোকেরা মধুর ভাষণ দিত, এখন খারাপ লোকেরা অশ্লীল ও ভয়ংকর ভাষণ দেন, তাদের বাণীকেও মনে হয় ডাস্টবিন উপচে গলগল করে বেরিয়ে আসা বর্জ্য।

ডা. মিলনের খুব প্রিয় ছিল নাজিম হিকমতের লেখা জেলখানার চিঠি।

সেলিনা পারভীন ডাকেন কবিতাকে, 'বউমা।'

'জি মা।'

'তোমার মনে আছে, মিলনের খুব প্রিয় কবিতা ছিল "জেলখানার চিঠি"।'

'জি মা।'

'বইটা একটু খুঁজে বের করতে পারবা?'

'খুঁজে দেখি, মা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতা ডা. মিলনের সংগ্রহ করা বইয়ের র‍্যাকের কাছে যান। বইটা পাওয়া যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে নাজিম হিকমতের কবিতা।

তিনি বইটা তার শাশুড়ির হাতে দেন।

বইয়ের ভেতরে পাতায় মিলনের নিজের হাতে লেখা নাম। বইটা বোধ হয় সে কবিতাকে উপহার দিয়েছিল।

সেলিনা পারভীন আঁচল দিয়ে মোছেন সেই পাতাগুলো।

পাতা ওল্টান। পড়েন। বলেন, 'আজকাল চোখে দেখতে অসুবিধা হয়।'

কবিতা বলেন, 'দিন, মা। আমি পড়ে শোনাচ্ছি...'

প্রিয়তমা আমার,
তোমার শেষ চিঠিতে
তুমি লিখেছ :
মাথা আমার ব্যথায় টনটন করছে,
দিশেহারা আমার হৃদয়।
তুমি লিখেছ :
যদি ওরা তোমাকে ফাঁসি দেয়
তোমাকে যদি হারাই,
আমি বাঁচব না।

তুমি বেঁচে থাকবে প্রিয়তমা বধূ আমার
আমার স্মৃতি কালো ধোঁয়ার মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে
তুমি বেঁচে থাকবে, আমার হৃদয়ের রক্তকেশী ভগিনী,
বিংশ শতাব্দীতে,
মানুষের শোকের আয়ু
বড়জোর এক বছর।

মৃত্যু...
দড়ির একপ্রান্তে দোদুল্যমান শবদেহ
আমার কাম্য নয়, সেই মৃত্যু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু প্রিয়তমা আমার, তুমি জেনো
জল্লাদের লোমশ হাত
যদি আমার গলায়
ফাঁসির দড়ি পরায়
নাজিমের নীল চোখে ওরা বৃথাই খুঁজে ফিরবে ভয়।
অন্তিম উষার অস্ফুট আলোয়
আমি দেখব, আমার বন্ধুদের, তোমাকে দেখব।
আমার সঙ্গে কবরে যাবে
শুধু আমার
এক অসমাপ্ত গানের বেদনা।

বধূ আমার,
তুমি আমার কোমল প্রাণ মৌমাছি
চোখ তোমার মধুর চেয়েও মিষ্টি।
কেন তোমাকে আমি লিখতে গেলাম
ওরা আমাকে ফাঁসি দিতে চায়
বিচার সবেমাত্র শুরু হয়েছে
আর মানুষের মুণ্ডুটা তো বোঁটার ফুল নয়
যে ইচ্ছে করলেই ছিঁড়ে নেবে।

ও নিয়ে ভেবো না
ওসব বহু দূরের ভাবনা
হাতে যদি টাকা থাকে
আমার জন্যে কিনে পাঠিয়ো গরম একটা পাজামা
পায়ে আমার বাত ধরেছে।
ভুলে যেয়ো না
স্বামী যার জেলখানায়
তার মনে যেন সব সময় স্ফূর্তি থাকে
বাতাস আসে, বাতাস যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেরির একই ডাল একই ঝড়ে
দুবার দোলে না।

গাছে গাছে পাখির কাকলি
পাখাগুলো উড়তে চায়।
জানলা বন্ধ :
টান মেরে খুলতে হবে।

আমি তোমাকে চাই :
তোমার মতো রমণীয় হোক জীবন
আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তমার মতো।...

আমি জানি, দুঃখের ডালি
আজও উজাড় হয়নি
কিন্তু একদিন হবে।

যে সমুদ্র সব থেকে সুন্দর
তা আজও আমরা দেখিনি।
সব থেকে সুন্দর শিশু
আজও বেড়ে ওঠেনি।
মধুরতম যে কথা আমি বলতে চাই
সে কথা আজও আমি বলিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~